রবীন্দ্র সকাল

রবীন্দ্র-জন্মের ১২৫-বছর পূর্তিতে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বয়স তখন ছিল কাঁচা, হালকা দেহখানা
ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা
*　*　*　*　*　*
ভাবনাগুলো তারি মধ্যে ফিরত থাকি থাকি
বানের জলে শ্যাওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি।

রবীন্দ্রনাথ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্-অনুমোদিত
বিদ্যালয়ের বাংলা-ভাষার সহায়ক পাঠ

রবীন্দ্র-সকাল

গ্রন্থনা

মনোজ দত্ত

সেকাল একাল
কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১, ১৯৮৬

প্রচ্ছদ ঃ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

অলংকরণ ঃ কৃষ্ণেন্দু চাকী
সুব্রত চৌধুরী

অঙ্গসজ্জা ঃ বিজন ভট্টাচার্য

মুদ্রণ ঃ আশুতোষ লিথোগ্রাফিক কোং
১৩ ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা ৬

প্রকাশক ঃ গৌতম দত্ত
১৮বি/১সি টেমার লেন,
কলিকাতা-৯

প্রস্তাবনা

কোন এক পঁচিশে বৈশাখ
আট বছরের একটি বালককে
তার চেয়েও ছোট
আর-এক শিশু নিয়ে
গল্প বলতে শুরু করি।
শুনতে শুনতে সে বলে—
তারপর! তারপর কী হল?
তারপর, পর পর সেই শিশুটির
ছেলেবেলা নিয়ে অনেক কথন।
আর তা-সব সাজিয়ে-গুছিয়েই
এই পুস্তিকার গ্রন্থন।

গ্রন্থনের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি
আমার, এই কথকের।
ভালো যদি কিছু থেকেই থাকে
তা রবি ঠাকুরের।
তাঁকে নিয়েই তো
এই সাত-কাহন।
আর তার সবটুকুই—
তাঁরই কাছে ধার করা।
তাই,
জন্মের ১২৫-বছর পূর্তিতে এই
'রবীন্দ্র-সকাল' দিয়েই তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি।
নাকি ঋণ স্বীকার!

মনোজ দত্ত

প্রথম যাকে গল্প বলি,
অরুণাভ
লেখার পর প্রথম যে পড়ে,
অমিতাভ
এই বই সেই দুই ভাইকে।

— বাবা

বিষয়-সূচী

সেকেলের কলকাতা ১৩
ভূত পেতনী ব্রহ্মদত্যি ১৬
ঠাকুর বাড়ির পালকি ১৮
আবদুল মাঝির নেকড়ে বাঘ ২০
কুমির আর কাঁচি বেদেনি ২৩
সিঙিমামা কাটুম ২৫
জল পড়ে পাতা নড়ে ২৭
শিশু-রবির মাস্টারি ৩০
ঈশ্বরের খবরদারি ৩২
নিয়ামত খলিফার অবহেলা ৩৪
গন্ডির বন্ধনে শিশু-রবি ৩৬
ইস্কুল ফাঁকির ফন্দি-ফিকির ৪০
স্বর্গের সেই বাগান ৪২
না-দেখা রাজবাড়ি ৪৫

আঁধার থাকতেই আরম্ভ..৪৭
কালো ছাতা এগিয়ে আসে..৫০
বাংলা পরীক্ষায় প্রথম..৫৩
প্রাইজ না-পাওয়ার প্রাইজ..৫৫
সেই বয়সের বিস্ময়..৫৮
চিংড়িমাছ আর পান্তাভাত..৬১
কবিতা লেখা শুরু..৬৪
কবিতা চুরির অপবাদ..৬৭
গান শুনে মা অবাক..৬৯
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর..৭২
ওপারেতে ঝাপ্‌সা গাছপালা..৭৫
দূর থেকে দেখা..৭৯
বৈদিকমতে উপনয়ন..৮১
প্রথম বোলপুর গমন..৮৩
দূরবীনের উল্টোদিকের দেশ..৮৫

চিত্র-সূচী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১১
জল পড়ে পাতা নড়ে
২৮
ওগো প্রাচীন বট
৩৯
স্বর্গের সেই বাগান
৪৩
কালো ছাতা এগিয়ে আসে
৫২
ওপারেতে ঝাপ্‌সা গাছপালা
৭৭
দূরবীনের উল্‌টাদিকের দেশ
৮৬
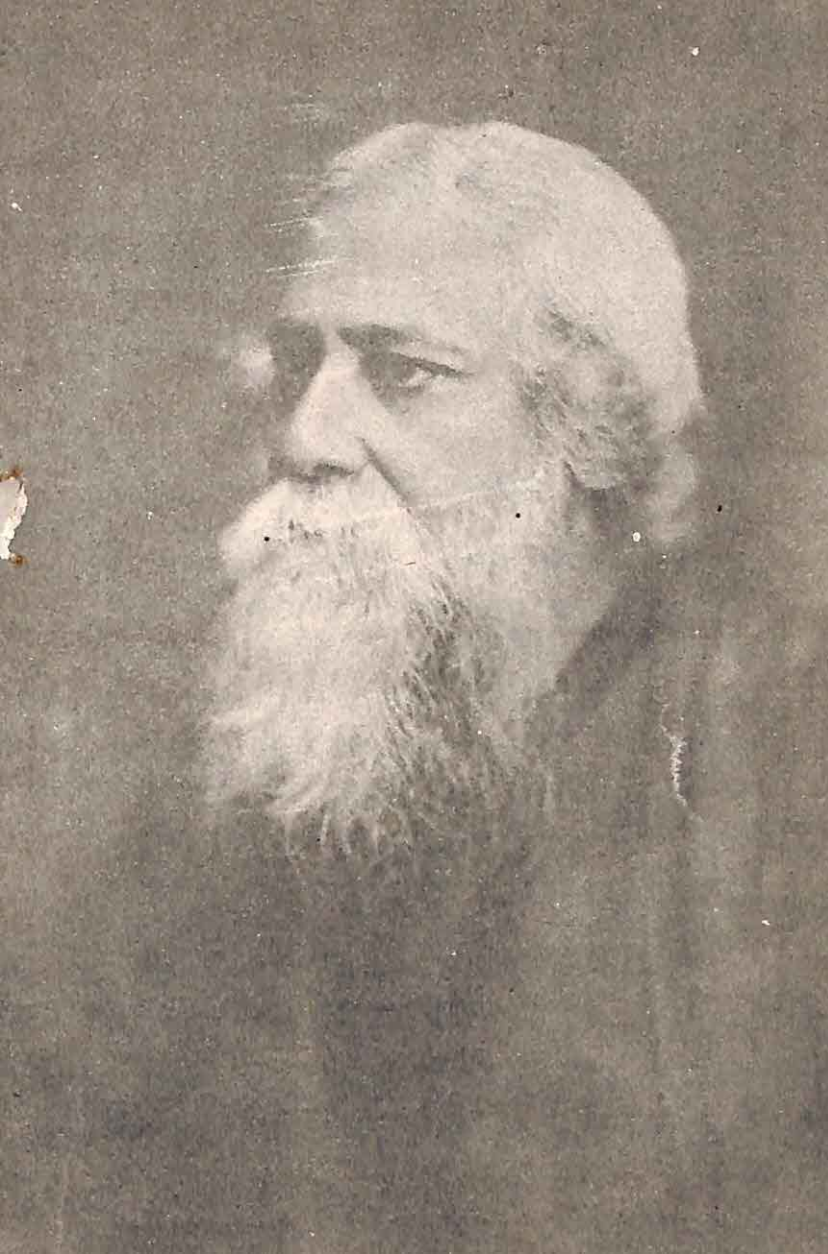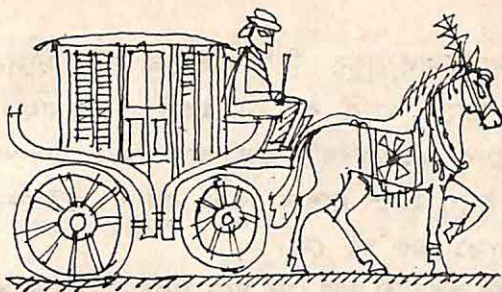
সেকেলের কলকাতা

"আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরের শ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্ছড়্ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটরগাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁস্ফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউ বা পালকি চড়ে কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার আধঘোমটাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সহিস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে।"

সেকেলের কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে যিনি জন্ম নিয়েছিলেন তিনি—রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ঋষি-তুল্য ব্যক্তি ছিলেন বলে সকলে তাঁকে 'মহর্ষি' বলতেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-তারিখটি ছিল আজ থেকে একশো পঁচিশ বছর আগে ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। খ্রীষ্টাব্দের হিসেবে—১৮৬১ এর ৭ই মে।

সেকেলের কলকাতা আর সেই সঙ্গে ঠাকুর বাড়ি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন ঃ

"তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি ; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ।

তখন জলের কল বসে নি। বেহারা বাঁকে ক'রে কলসী ভ'রে মাঘ-ফাগুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। এক-তলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। নীচের তলায় সেই-সব স্যাৎসেতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করে ছিল কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মতো, পা দুটো উলটো দিকে। সেই ভুতুড়ে ছায়ার সামনে দিয়ে যখন বাড়িভিতরের বাগানে যেতুম, তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে লাগত তাড়া।

তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার

জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট টেনে দেওয়া হত ঝরঝর কলকল করে ঝরনার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উলটো দিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। শেষকালে এল সেই পুকুরের কাল ঘনিয়ে, পড়ল তার মধ্যে গাড়ি-গাড়ি রাবিশ। পুকুরটা বুজে যেতেই পাড়াগাঁয়ের সবুজ-ছায়া-পড়া আয়নাটা যেন গেল সরে। সেই বাদামগাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অমন পা ফাঁক করে দাঁড়াবার সুবিধে থাকতেও সেই ব্রহ্মদত্যির ঠিকানা আর পাওয়া যায় না।

ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে।"
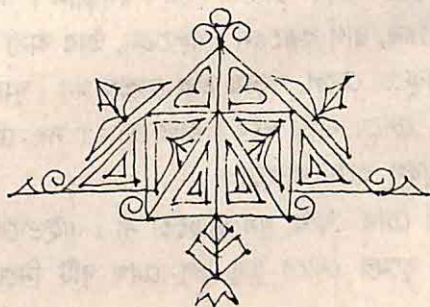
ভূত পেতনী ব্রহ্মদত্যি

ভূতের আর ব্রহ্মদত্যির কথা যখন এসেই গেল তখন সেই সুযোগে ভুতুড়ে ব্যাপার নিয়ে শিশু-রবীন্দ্রনাথের কথা শোনাই।

মাস্টারমশায় অঘোর-বাবু দুই সলতের সেজের আলোয় রবীন্দ্রনাথকে পড়াতেন প্যারী সরকারের ফারস্ট্ বুক। পড়তে পড়তে রবির প্রথমে হাই উঠতো, তারপর ঘুম আসতো, তারপর হাত দিয়ে চলতো চোখ-রগড়ানি। মাস্টারমশায় বিরক্ত হতেন, রাগ করতেন ; বলতেন, তাঁর অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকুরো ছেলে, পড়ায় তার আশ্চর্য মন ; ঘুম পেলে হাই তুলে না, চোখে নস্যি ঘষে। আর তুমি ! সব ছেলের মধ্যে একলা মুর্‌খু হয়ে থাকবে।

রবির চোখ থেকে ঘুম ছাড়তো না। এইভাবে রাত ন'টা বাজলেই ঘুমের ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখ দুটি নিয়ে রবি ছুটি পেতো।

বাইর-মহলের পড়ার ঘর থেকে একটা গলিপথ দিয়ে রবিকে যেতে হতো বাড়ির ভেতর-মহলে। সেই সরু গলিপথটি ছিলো খড়খড়ির আব্রু-দেওয়া, উপর থেকে ঝুলতো মিট্‌মিটে আলোর লণ্ঠন।

চলতে চলতে রবির মনে হতো, কী জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ তার শিউরে উঠতো। ভূত-প্রেতের কত গুল্প-গুজব শুনেছে সে, তাই তারা তার মনের আনাচে-কানাচেই থাকতো। বাড়ির এক দাসীর কাছে সে শুনেছে, শাঁকচুন্নির নাকি সুরের গলা আর দড়াম ক'রে আছাড় খেয়ে পড়া ! ওই মেয়ে-ভূতটা যাকে পেতনী বলে, ছিলো সবচেয়ে বদমেজাজি। আর তার লোভ ছিলো সবচেয়ে বেশি মাছের উপর।

অনেকের মুখেই শুনেছে রবি বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘন-পাতা-ওয়ালা যেবাদামগাছটা আছে, তারই ডালে একটা পা আর অন্য পা'টা তেতালার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা ছায়া-মূর্তি।
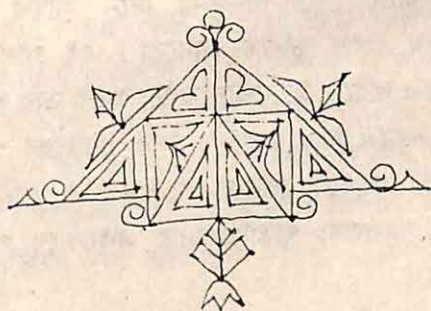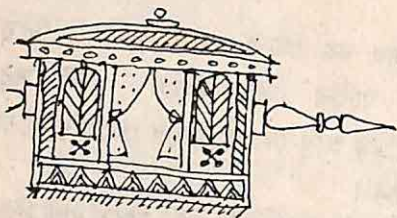
ঠাকুর বাড়ির পালকি

রবি ঠাকুরের ঠাকুরমাদের আমলের একটি পালকি ছিলো। পালকিটা নবাবি ছাঁদের আর বহর ছিলো খুব দরাজ। ডাণ্ডা দুটো এতো বড়ো ছিলো যে, চারজন চারজন একুনে আটজন বেহারা লাগতো তাকে বইতে। হাতে সোনার কাঁকন, কানে মোটা মাকড়ি, আর গায়ে লালরঙের হাতকাটা মেরজাই-পরা বেহারারা ঘরের মেয়েদের কুটুম্ব-বাড়ি নিয়ে যেতো। অথবা পূজা-পাব্বনের দিনে বাড়ির গিন্নিমাকে পালকি-সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনতো। এই পালকির গায়ে ছিলো রঙিন লাইনে আঁকজোক কাটা, কতক তার ক্ষয়ে গেছে, যেখানে-সেখানে দাগ ধরেছে। আর ভেতরের গদি থেকে নারকোলের ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে। এ যেন একালের নাম-কাটা আসবাব, খাতাঞ্চিখানার এককোণে পড়ে আছে অবহেলায়।

দরকারের কাজ হতে ওকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এইজন্যেই ওর উপরে রবির অতোটা মনের টান। রবি ভাবতো—"ও যেন সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ, আর আমি ছুটির দিনের রবিন্‌সন্‌-ক্রুসো, বন্ধ দরজার মধ্যে ঠিকানা হারিয়ে চার দিকের নজরবন্দি এড়িয়ে বসে আছি।" রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত-আট বছর।

সেই পালকি নিয়েই আরেক দিনের ঘটনা। 'বেলা বেড়ে গিয়েছে, রোদ্দুর উঠেছে কড়া হয়ে। এমন সময় দেউড়িতে ঘণ্টা বেজে ওঠে। কিন্তু পালকির ভেতরকার দিকটা তো আর ঘণ্টা মানে না। সেখানকার দুপুর বারোটা সেই সাবেক কালের। যখন রাজবাড়ির সিংহ-দরজায় সভাভঙ্গের ডঙ্কা বাজতো আর রাজা রওনা হতেন স্নানে, চন্দনের জলে। ছুটির দিনের সেই দুপুরবেলায় যাদের তাঁবেদারিতে রবি থাকতো, তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে মজাসে ঘুম দিতো। আর রবি! তার মনে তখন চলতে থাকতো সেই অচল পালকি। মনে মনে ভাবতো, হাওয়ায় তৈরি বেহারাগুলো তার খেয়াল মতোই তো চলতে পারে। তাই—তাই তার খেয়ালের পথেই চলতে থাকে পালকি দূরে দূরে, দেশে দেশে। কখনো বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভেতর দিয়ে। সেখানে সেই গভীর গহনে বাঘের চোখ জ্বলজ্বল করে। আর রবির গা করে ছম্‌ছম্‌। কিন্তু ভয় কী ? সঙ্গে আছে যে মনের মানুষ শিকারী বিশ্বনাথ। তার বন্দুক ছুটলো দুম্‌, ব্যাস সব চুপ।'
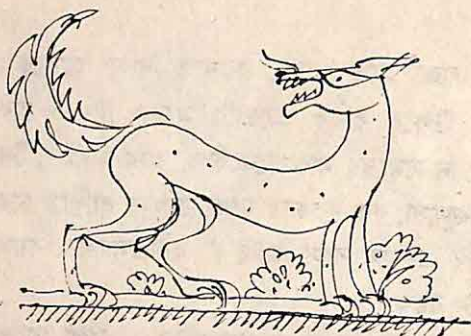
আবদুল মাঝির নেকড়ে বাঘ

তারপরে পালকির চেহারা বদলে হ'য়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খী লা, ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙ্গা দেখা যায় না। ছপ্-ছপ্ ছপ্ছপ্ দাঁড় পড়তে থাকে, ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে, ফুলে ফুলে। আর তখন মাল্লারা বলে ওঠে—সামাল ভাই, সামাল। ঝড় উঠল ব'লে।

কিন্তু হাল ধরে ব'সে আছে আবদুল মাঝি। তার ছুঁচলো দাড়ি, কামানো গোঁফ, আর নেড়া মাথা। রবির চেনা সে আগে থেকেই। সেই তো তার দাদাকে এনে দিতো পদ্মা থেকে ধরে আনা ইলিশমাছ আর কচ্ছপের ডিম।

আবদুল মাঝি একদিন একটা গল্প বলেছিলো রবিকে।

"একদিন চত্তির মাসের শেষে ডিঙ্গিতে মাছ ধরতে গিয়েছে, হঠাৎ এল কালবৈশাখী। ভীষণ তুফান, নৌকা ডোবে ডোবে। আবদুল দাঁতে রশি কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে,

সাঁৎরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে তুলল তার ডিঙি।”

গল্পটা যেন শুরু না হতেই শেষ হয়ে গেল—এটা রবির পছন্দ হলো না। তাই সে আবদুলকে বলল, “নৌকাটা ডুবল না, অমনিই বেঁচে গেল, এতো গপ্‌পই নয়।” আচ্ছা বলো তারপর কী হলো ?

আবদুল বললে, “তার পর সে এক কাণ্ড। দেখি, এক নেকড়ে বাঘ। ইয়া তার গোঁফজোড়া। ঝড়ের সময়ে সে উঠেছিল ওপারে গঞ্জের ঘাটের পাকুড় গাছে। দমকা হাওয়া যেমনি লাগল গাছ পড়ল ভেঙে পদ্মায়। বাঘ ভায়া ভেসে যায় জলের তোড়ে। খাবি খেতে খেতে উঠল এসে চরে। তাকে দেখেই আমার রশিতে লাগালুম ফাঁস। জানোয়ারটা এত্তো বড়ো চোখ পাকিয়ে দাঁড়ালো আমার সামনে। সাঁতার কেটে তার জমে উঠেছে খিদে। আমাকে দেখে তার লাল-টকটকে জিভ দিয়ে নাল ঝরতে লাগল। বাইরে ভিতরে অনেক মানুষের সঙ্গে তার চেনাশোনা হয়ে গেছে, কিন্তু আবদুলকে সে চেনে না। আমি ডাক দিলুম 'আও বাচ্ছা'। সে সামনের দু পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে, ছাড়াবার জন্যে যতই ছটপট করে ততই ফাঁস এঁটে গিয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়ে।”

এই পর্যন্ত শুনেই ব্যস্ত হয়ে রবি বললো, 'আবদুল, বাঘটি মরে গেল নাকি ?' আবদুল বললে, “মরবে তার বাপের সাধ্যি কী। নদীতে বান এসেছে, বাহাদুরগঞ্জে ফিরতে হবে তো ? ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্ছাকে দিয়ে গুণ টানিয়ে নিলেম

অন্তত বিশ ক্রোশ রাস্তা। গোঁ গোঁ করতে থাকে, পেটে দিই দাঁড়ের খোঁচা, দশ-পনেরো ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘন্টায় পৌঁছিয়ে দিলে। তার পরেকার কথা আর জিগ্‌গেস কোরো না বাবা, জবাব মিলবে না।"
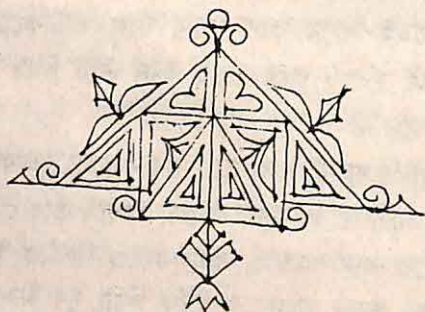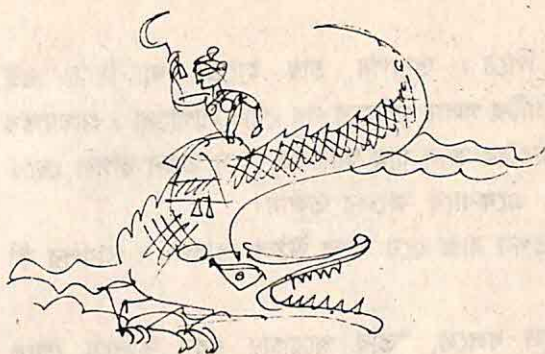
কুমির আর কাঁচি বেদেনি

আরেক দিন। আবদুল মাঝিকে কাছে পেয়ে রবি বললে, আজ আর বাঘ না, এবার বলো কুমির।

আর অমনি শুরু করলো আবদুল। জলের উপর কুমিরের নাগের ডগা আমি অনেকবার দেখেছি। শুধু তাই-ই নয়। নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শুয়ে কুমির যখন রোদ পোহায়, আমার তখন মনে হয় সে ভারি বিচ্ছিরি হাসি হাসছে। কাছে বন্দুক ছিলো না, তাই মোকাবিলা হয় নি।

কিন্তু একদিন হল কি এক বেদেনি, কাঁচি তার নাম, ডাঙায় বসে বসে বাখারি চাঁচছে, দা দিয়ে। আর তার ছাগল-বাচ্চাটা পাশেই বাঁধা। তাকে দেখেছে কুমিরটা কোন্ ফাঁকে। সেকি আর থাকতে পারে! কখন নদী থেকে উঠে এসে পাঁঠার ঠ্যাঙ দুটো ধরে জলে টেনে নিয়ে গেলো। যেই না ডুববে অমনি দেখতে পেল কাঁচি বেদেনি। সে তখন এক লাফে উঠে বসলো

কুমিরের পিঠে। তারপর তার হাতের দা দিয়ে ওই দানোগিরগিটির গলায় পোঁচের পর পোঁচ লাগালো। আঘাতের চোটে কুমিরটার জান যায় আর কি। সে তখন ছাগল ছেড়ে এক ডুবে একেবারে জলের তলায়।

রবি তখন ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠল, তারপর! তারপর কী হল?

আবদুল বললে, "তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তুলে আনতে দেরি হবে। আসছে-বার যখন দেখা হবে চর পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে আসব।"

"কিন্তু আর তো সে আসে নি, হয়তো খোঁজ নিতে গেছে।"
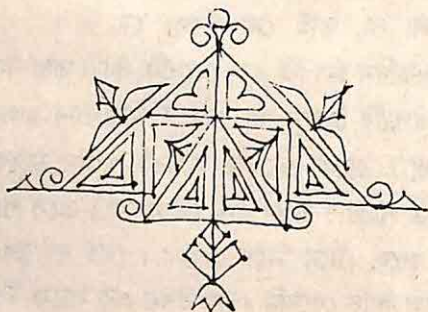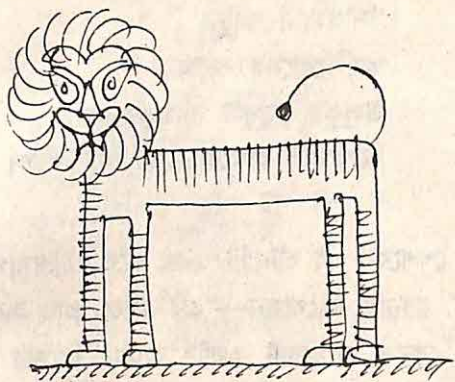
সিঙিমামা কাটুম

সেই শিশু-বয়সে রবির একটা ভারি মজার খেলা ছিলো। কাঠের তৈরি একটা সিঙি নিয়ে সে খেলা করতো। পুজোর সময় বলিদানের গপ্পো শুনতে শুনতে রবির একবার ইচ্ছে হলো, সেও তো তার সিঙিকে বলি দিতে পারে।

কিন্তু বলিদানের জন্য চাই হাড়িকাঠ। তা সে কোথায় পায় ? শেষে খুঁজেপেতে একটি হাড়িকাঠ সংগ্রহ করলো। তারপর ! তারপর সিঙিকে হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে তার পিঠে কাঠির খাঁড়া দিয়ে কোপের পর কোপ দিতে লাগলো। শুধু কোপ দিলে বলিদান হয় না। মন্তরও চাই, নইলে পুজো পুজোই নয়। হঠাৎ-ই একটা মন্ত্র এসে গেল—

'সিঙিমামা কাটুম
আন্দিবোসের বাটুম
উলুকুট ঢুলুকুট ঢ্যাম্‌কুড়কুড়
আখরোট বাখরোট খট খট খটাস
পট পট পটাস।'

বুড়ো বয়সে শৈশবের এই ঘটনাটি স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেবেলা' রচনায় লিখেছেন—"এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার-করা, কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের। আখরোট খেতে ভালোবাসতুম। খটাস শব্দ থেকে বোঝা যাবে আমার খাঁড়াটা ছিল কাঠের। আর পটাস শব্দে জানিয়ে দিচ্ছে সে খাঁড়া মজবুত ছিল না।"
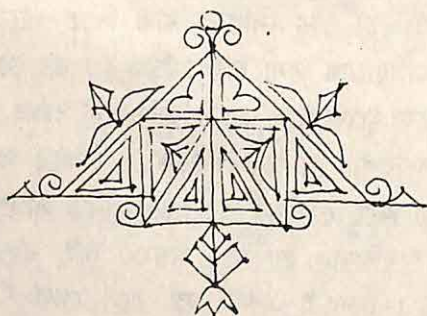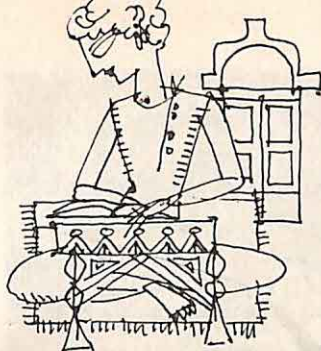
জল পড়ে পাতা নড়ে

কাঠের সিঙি নিয়ে কাঠেরই তৈরি খাঁড়া দিয়ে যখন বলিদান বলিদান খেলতো রবি তখনই তার লেখাপড়ায় হাতে-খড়ি। তবে একা একা নয়, সাথে আরও দুই শিশু—দু-বছরের বয়সে বড়ো, তার দাদা সোমেন্দ্রনাথ আর দাদারই বয়েসী ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

শিক্ষারম্ভের প্রথম-স্মৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় লিখেছেন ঃ

"কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কুল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।'

মনে পড়ে,
'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান'—
ওই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।

জল পড়ে পাতা নড়ে

তাহার পরে যে-কথাটা মনে পড়িতেছে তাহা ইস্কুলে যাওয়ার সূচনা। একদিন দেখিলাম, দাদা এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্য ইস্কুলে গেলেন, কিন্তু আমি ইস্কুলে যাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইলাম না। উচ্চৈঃস্বরে কান্না ছাড়া যোগ্যতা প্রচার করার আর-কোনো উপায় আমার হাতে ছিল না। ইহার পূর্বে কোনোদিন গাড়িও চড়ি নাই বাড়ির বাহিরও হই নাই, তাই সত্য যখন ইস্কুল-পথের ভ্রমণবৃত্তান্তটিকে অতিশয়োক্তি-অলংকারে প্রত্যহই অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল তখন ঘরে আর মন কিছুতেই টিকিতে চাহিল না। যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাতসহ এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন, 'এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।"
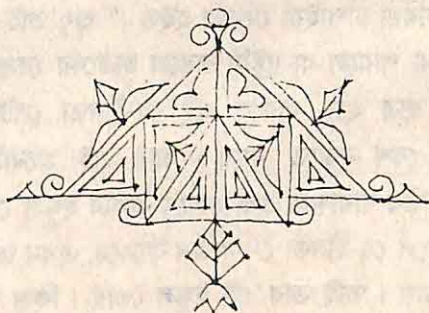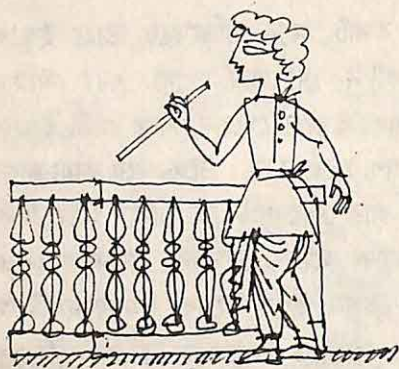
শিশু-রবির মাস্টারি

কান্নার জোরে নিতান্ত অল্প বয়সেই রবি ইস্কুলে ভর্তি হয়। ওই শিশু-বয়সে সে কী শেখে বয়স্ককালে কিছুই তার মনে পড়ে নি। শুধু মনে পড়েছে, "একটা শাসনপ্রণালীর কথা—পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি স্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত।" শুধু তাই-ই নয়, পড়া বলতে না পারলে বা দুষ্টুমি করলে ছাত্রদের বেত্রাঘাতও করা হতো। ছাত্র হয়ে থাকার এই যে-হীনতা সেটা রবি সেই বয়সেই বেশ বুঝতে পারে। আর এই জন্যেই শিশু-রবি বাইর-বাড়ির বারান্দার এক কোণে একটা ইস্কুল খোলে। ছাত্র হয়ে ইস্কুলে যে-হীনতা সে অর্জন করেছে, এখন তার প্রতিকার করতে চায়। তাই তার এই ইস্কুল তৈরি। কিন্তু ছাত্র কারা? রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই শুনি—

"রেলিংগুলা ছিল আমার ছাত্র। একটা কাঠি হাতে করিয়া চৌকি লইয়া তাহাদের সামনে বসিয়া মাস্টারি করিতাম। রেলিংগুলার মধ্যে কে ভালো ছেলে এবং কে মন্দ ছেলে, তাহা একেবারে স্থির করা ছিল। এমনকি ভালো-মানুষ রেলিং ও দুষ্ট রেলিং, বুদ্ধিমান রেলিং ও বোকা রেলিংঙের মুখশ্রীর প্রভেদ আমি যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতাম। দুষ্ট রেলিংগুলার উপর ক্রমাগত আমার লাঠি পড়িয়া পড়িয়া তাহাদের এমনি দুর্দশা ঘটিয়াছিল যে, প্রাণ থাকিলে তাহারা প্রাণ বিসর্জন করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিত। লাঠির চোটে যতই তাহাদের বিকৃতি ঘটিত ততই তাহাদের উপর রাগ কেবলই বাড়িয়া উঠিত; কী করিলে তাহাদের যে যথেষ্ট শাস্তি হইতে পারে, তাহা যেন ভাবিয়া কুলাইতে পারিতাম না। আমার সেই নীরব ক্লাসটির উপর কী ভয়ঙ্কর মাস্টারি যে করিয়াছি, তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য আজ কেহই বর্তমান নাই।"
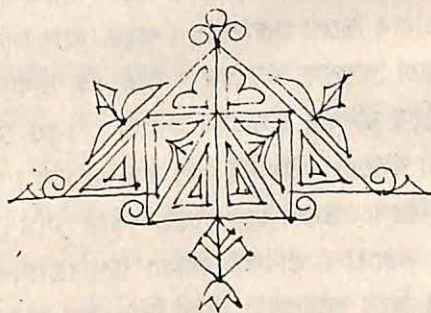
ঈশ্বরের খবরদারি

ঈশ্বর নামে একজন একদা কোনো-এক-গাঁয়ে গুরুগিরি করতো। তারপর সে ঠাকুর-বাড়িতে ছোটদের খবরদারির কাজ পায়।

তার মাথার আর গোঁফের চুল কাঁচা-পাকায় ভরা। মুখের চামড়া টানটান শুকনো। গম্ভীর মেজাজ তার আর কড়া তার গলা। সে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতো। গুরুমশায় ব'লে তার মুখের ভাষাও ছিলো গুরুমশায়ি। বাবুরা 'বসে আছেন' না বলে সে বলতো 'অপেক্ষা করছেন'। তার এই ভাষা-প্রয়োগ শুনে ঠাকুরবাড়ির মনিবরা হাসাহাসি করতো। তবুও সে এইভাবেই কথাবার্তা বলতো। এমনিই ছিল তার গুমোর। আবার, তার শুচিবাই ছিলো প্রচণ্ড। স্নান করতে পুকুরে নেমে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতো। তারপর জলের উপরিভাগের তেলভাসা জল হাত দিয়ে কয়েকবার ঠেলে দিয়ে ঝুপ ক'রে একটা ডুব

দিতো। এই হলো তার স্নানের কায়দা। স্নানের পর জল থেকে উঠে পুকুর পাড় ধরে হাত বেঁকিয়ে এমনভাবে চলতো তাতে মনে হতো, আশপাশের নোংরা তাকে যেন ছুঁতে আসছে। চলনে-বলনে কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ঠিক নয়, এ নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামাতো ঈশ্বর। কিন্তু মজার কথা হলো, আহারে তার ছিলো দারুণ লোভ।

সকালবেলায় রবিদের খাওয়ানোর সময় তাদের পাতে একটা-একটা ক'রে লুচি আলগোছে দুলিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করতো, 'আর দেব কি'! কোন্ উত্তর সে পেতে চায় তা ওই ছোট্ট রবিও টের পেতো। তাই সে বলতো, 'চাই নে'। উত্তর শুনে ঈশ্বর মহা খুশি। আসলে তো সে সেটাই চায়। লুচি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পরে মজাসে খেতো সে। শুধু লুচিই নয়, দুধের বাটির উপর ছিলো তার আরও লোভ। আর রবি ছিলো একেবারেই নির্লোভী। দুধ খেতে রবির ইচ্ছেই করতো না। ফলে, একটা আলমারির শেলফে বড় পিতলের বাটিতে দুধ আর কাঠের বারকোশে লুচি-তরকারি ঈশ্বর লুকিয়ে রাখতো। সময়-সুযোগ বুঝে ভোজন করতো।

তবে সন্ধ্যাবেলায় ছেলেদের সংযত করবার জন্য সে রামায়ণ-মহাভারত পাঠ ক'রে শোনাতো। রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারদিকে সবাই স্থির হয়ে বসে হাঁ ক'রে শুনতো। চাকর-বাকরদের মধ্যে আরও দু-চারজন শ্রোতা জুটে যেতো। ঈশ্বর যে-দিন লব-কুশেরকথা বলতো সেদিন ভারি মজা পেতো রবিরা। ছোটদের কাছে রাম-লক্ষ্মণ কেমন জব্দ!
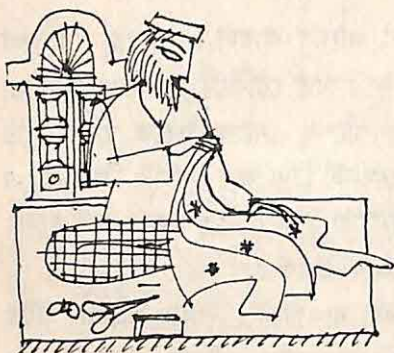
নেয়ামত খলিফার অবহেলা

রবীন্দ্রনাথের শিশুকালে ছোটদের ভোগবিলাসের তেমন আয়োজন ছিলো না। বিশেষ করে তাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি নজর দেওয়া হতো না। বাড়ির ছোটরা চাকর-বাকরদের শাসনে আর তদারকিতে থাকতো। আহারের শৌখিনতা তো ছিলোই না, পরনের কাপড়-চোপড় ছিলো অতি সামান্য। তাই তো রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছেন, "বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল, আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম—কারণ, এমন কোনো অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই, পকেটে রাখিবার মতো

স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই ; বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটো যেখানে থাকিত সেখানে নহে।"

নিয়ামত খলিফা ছিলো ঠাকুর-বাড়ির স্থায়ী দরজি। বুড়ো দরজি আতস কাঁচের চশমা চোখে লাগিয়ে বাড়ির বারান্দার এক-কোণে ব'সে ঝুঁকে পড়ে কাপড়-সেলাইয়ের কাজ করতো। আর নামাজের সময় হলে উঠে মাঝে মাঝে নামাজ পড়তো। রবি চেয়ে চেয়ে দেখতো তাকে আর ভাবতো—কী সুখেই না নিয়মত আছে। তাকে পড়তে হয় না, অংক কষতে হয় না,····!
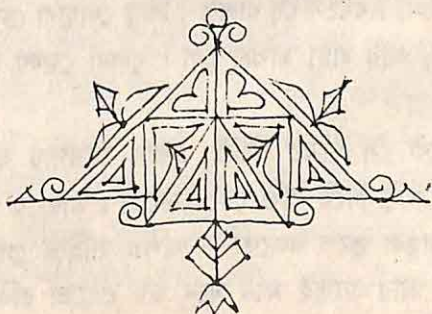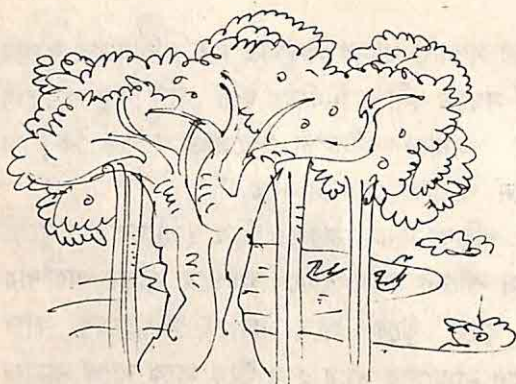
গণ্ডির বন্ধনে শিশু-রবি

তখনকার দিনে অবস্থাপন্ন পরিবারের বাড়িগুলো এখনকার মতো ছিলো না। বাড়ির একটা বাইর-অংশ বা সদর, আরেকটা ভেতরের দিক বা অন্দর-মহল। বাইর বাড়িতে দোতলার একটা ঘরে চাকরদের মহলে রবি এবং তার দাদা সোম ও ভাগ্নে সত্য প্রায় সারাটা দিন থাকতো। শ্যাম নামে একজন চাকর ছিলো। বয়সে সে বালক। কিন্তু দোহারা চেহারা তার ; শ্যাম বর্ণ, আর লম্বা মাথার চুল। খুলনা জেলা ছিলো তার বাড়ি।

রবিকে সে ঘরের নির্দিষ্ট একটা জায়গায় বসিয়ে তার চারপাশে খড়ি দিয়ে গণ্ডি কেটে দিতো। তারপর গম্ভীর মুখে একটা আঙুল তুলে বলতো—"গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ।" আর এতেই মনে মনে ভয় পেতো রবি। কেননা, ইতিমধ্যেই সে ঈশ্বর নামে গুরুমশাইয়ের কাছ থেকে রামায়ণ

পাঠ শুনেছে। "গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল" রবির তা জানা। তাই, সে "গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিত না।"

এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"জানালার নিচেই একটা ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী। গণ্ডি-বন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহ-বা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলো ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত ; কেহ-বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত ; কেহ-বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বারবার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ একসময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত ; কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত ; কেহ-বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত ; কেহ-বা ব্যস্ত, কোনোমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক ; কাহারো-বা ব্যস্ততা লেশমাত্র নাই—ধীরেসুস্থে স্নান করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড়

ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই-তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু-বা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ দোদুল-গতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলো ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই বটকেই উদ্দেশ্য করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—

নিশিদিন দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।"
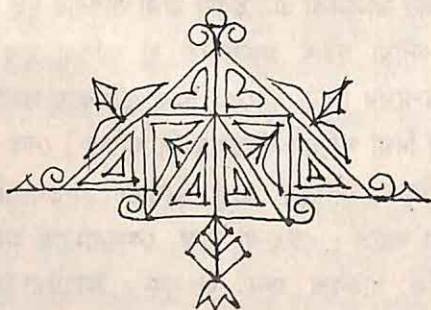
ওগো প্রাচীন বট
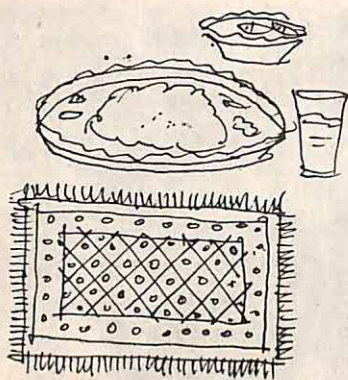
ইস্কুল ফাঁকির ফন্দি-ফিকির

কম খেলে কী হবে। রবির গায়ে দারুণ জোর। অসুখ-বিসুখ বিন্দু-বিসর্গ নেই। তাই ইস্কুলে ফাঁকি দেওয়ার কোন অছিলা পায় না সে। সেজন্য শরীরে অসুখ আনতে তার ফন্দি-ফিকিরও কম নয়।

জুতো জলে ভিজিয়ে প'রে থাকে সারাদিন যদি তার সর্দি-জ্বর হয়। কিন্তু হায়! তবু তার না সর্দি না-জ্বর। কার্তিক মাসে খোলা ছাদে সে শোয়, চুল জামা সব হিমে ভিজে যায়। কিন্তু গলাতে খুসখুসুনি কাশিরও টের পায় না সে। শরীর খারাপের অজুহাতে কিছুতেই সে ইস্কুলে ফাঁকি দিতে পারে না। অথচ ইস্কুলের খাঁচায় ঢুকতে সে চায় না।

শেষে একদিন মায়ের কাছে গিয়ে বলে, পেটকামড়ানি দারুণ, ভেতরে ভেতরে বদহজম। শুনে মা মনে মনে হাসে। তারপর একজনকে ডেকে বলে, ইস্কুলে গিয়ে মাস্টারকে

জানিয়ে দিয়ে এসো—রবিকে আজ আর পড়াতে হবে না।

ছেলেবেলায় রবির দেহটা ছিলো একগুঁয়ে রকমের ভালো। জ্বরে তাকে ভুগতে হয় নি তেমন, হাম বা বসন্তও তার গা ঘেঁসে নি। এমন কি গায়ের কোন ফোঁড়া কাটার জন্য তার দেহে ছুরির আঁচড় পড়ে নি কখনও।

তাহলে কি কোনদিনই রবির জ্বরজালা হয় নি? হয়েছে বৈকি। তবে দৈবাৎ কখনো-সখনো। তাকে বাড়ির কেউ জ্বর বলতো না, বলতো—গা-গরম। আর গা-গরম হলেই নীলমাধব ডাক্তার আসতেন। তখন থার্মোমিটার ছিলো না। তাই গায়ে হাত দিয়ে আর নাড়ী টিপে ডাক্তার বুঝতেন, দেহের তাপ কতটা। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করতেন ক্যাস্টর অয়েল খাওয়া আর উপোস দেওয়া। অল্প-সল্প জল অবশ্যি খেতে দেওয়া হতো। তবে গরম জল। তারপর তিন দিনের দিনেই পথ্য মিলতো গলা-গলা ভাতের সঙ্গে মৌরলা মাছের ঝোল। উপোসের পর সে-এক উপাদেয় ভোজন।
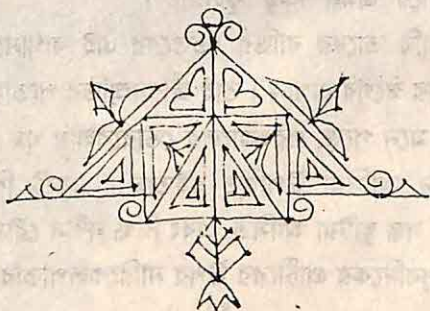
স্বর্গের সেই বাগান

ঠাকুরবাড়ির ভেতরে একটা বাগান ছিলো। বাগান বললে অবশ্যি অনেকটা বাড়িয়েই বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া, আর এক-একসারি নারকেল গাছ—এই নিয়েই সেই বাগান। বাগানের মাঝখানে ছিলো বাঁধানো গোলাকার একটা চাতাল। চাতালের ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে ঘাস। আর, মালীর পরিচর্যার অভাবেও বেঁচে থাকতে পারে এমন কিছু ফুলগাছ।

শিশু-রবি তাদের বাড়ির ভেতরের এই বাগানকেই মনে করতো, তার স্বর্গের বাগান। তাই জীবনস্মৃতির পাতায় লেখা ঃ

"বেশ মনে পড়ে, শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পূবদিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান

স্বর্গের সেই বাগান

ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।"

ঠাকুরবাড়ির উত্তর-অংশে একটা ফাঁকা জায়গায় ছিলো গোলাবাড়ি। আসলে ওখানে ধানের গোলাতে সারা বছরের শস্য সঞ্চিত থাকতো ; তাই সবাই বলতো 'গোলাবাড়ি'। এই গোলাবাড়ির প্রতি রবির ভীষণ আকর্ষণ। ছুটির দিনে সুযোগ পেলেই সে গোলাবাড়িতে আসতো।

সাধারণত খেলাতেই ছোটদের টান বেশি। অথচ রবির কাছে এটা ব্যতিক্রম। খেলা থেকেও তার টান ছিলো এই গোলাবাড়ির। কেন যে টান ছোট্ট-রবি নিজেই তা জানতো না। এ সম্পর্কে প্রৌঢ়-রবির আপন কথায় ঃ

"তাহার কারণ কী বলা শক্ত। বোধহয় বাড়ির কোণের একটা নিভৃত পোড়ো জায়গা বলিয়াই আমার কাছে তাহার কী একটা রহস্য ছিল। সে আমাদের বাসের স্থান নহে, ব্যবহারের ঘর নহে ; সেটা কাজের জন্যও নহে ; সেটা বাড়িঘরের বাহিরে, তাহাতে নিত্যপ্রয়োজনের কোনো ছাপ নাই ; তাহা শোভাহীন অনাবশ্যক পতিত জমি, কেহ সেখানে ফুলের গাছও বসায় নাই ; এইজন্য সেই উজাড় জায়গাটায় বালকের মন আপন ইচ্ছামতো কল্পনায় কোনো বাধা পাইত না। রক্ষকদের শাসনের একটিমাত্র রন্ধ্র দিয়া যেদিন কোনোমতে এইখানে আসিতে পারিতাম সেদিন ছুটির দিন বলিয়াই বোধ হইত।"

না-দেখা রাজবাড়ি

ঠাকুরবাড়িতে আর ছিলো রাজার বাড়ি বা রাজবাড়ি। কিন্তু মজার কথা এই, সেই বাড়িটা যে কোথায় তা রবি নিজেও জানতো না, জানতেও পারে নি কোনোদিন। জানতো কেবল তার খেলার সঙ্গিনী ইরাবতী, সম্পর্কে ভাগিনী। বয়সে সে রবির থেকে এক বছরের ছোট। কিন্তু তার তাক-লাগানো বুদ্ধি ছিলো রবির থেকে অনেক বেশি। মাঝে মাঝেই সে রবিকে বোকা বানাতো। এই ইরাবতী আর তার রাজবাড়ি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"তার কোনো-এক সাতমহল রাজবাড়ি নিয়ে সে আমাকে ছট্‌ফটিয়ে তুলেছিল। কোনো ঠিকানা পাই নি। একমাত্র সেই জানত রাজার বাড়ির সন্ধান। আমি পড়তুম থার্ড নম্বর রীডার ; মাস্টার মশায়কে জিগ্‌গেস করেছি, মাস্টার মশায় হেসে আমার কান ধ'রে টেনে দিয়েছেন।

জিগ্‌গেস করেছি ইরুকে, রাজবাড়িটা কোথায় বলো-না।

সে চোখ দুটো এতখানি ক'রে বলত, এই বাড়িতেই।

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতুম হাঁ ক'রে ; বলতুম এই বাড়িতেই !—কোন্‌খানে আমাকে দেখিয়ে দাও-না।

সে বলত, মন্তর না জানলে দেখবে কী করে।

আমি বলতুম, মন্তর আমাকে ব'লে দাও-না। আমি তোমাকে আমার কাঁচাআম-কাটা ঝিনুকটা দেব।

সে বলত, মন্তর বলে দিতে মানা আছে।

আমি জিগ্‌গেস করতুম, ব'লে দিলে কী হয়।

সে কেবল বলত, ও বাবা !

কী যে হয় জানাই হল না !—তার ভঙ্গী দেখে গা শিউরে উঠত। ঠিক করেছিলুম, একদিন যখন ইরু রাজবাড়িতে যাবে আমি যাব লুকিয়ে লুকিয়ে তার পিছনে পিছনে। কিন্তু সে যেত রাজবাড়িতে আমি যখন যেতুম ইস্কুলে। একদিন জিগ্‌গেস করেছিলুম, অন্য সময়ে গেলে কী হয়। আবার সেই 'ও বাবা'। পীড়াপীড়ি করতে সাহসে কুলোত না।"

"আরও অনেক কিছু ছিল তার অবাক-করা ঝুলিতে। কিন্তু, সবচেয়ে চমক লাগাতো সেই না-দেখা রাজবাড়িটা। সে যে একেবারে আমাদের বাড়িতেই, হয়তো আমার শোবার ঘরের পাশেই। কিন্তু, মন্তর জানি নে যে। ছুটির দিনে দুপুর বেলায় ইরুর সঙ্গে গেছি আমতলায়, কাঁচা আম পেড়ে দিয়েছি, দিয়েছি তাকে আমার বহুমূল্য ঘষা ঝিনুক। সে খোসা ছাড়িয়ে শুল্‌পো শাক দিয়ে বসে বসে খেয়েছে কাঁচা আম, কিন্তু মন্তরের কথা পাড়লেই বলে উঠেছে, ও বাবা !"

আঁধার থাকতেই আরম্ভ

আঁধার থাকতেই বিছানা থেকে উঠে দিনের কাজ শুরু হয় রবির। সেই আলো-আঁধারিতে রবি কুস্তি লড়ে। শীতের দিনে গা শিরশির ক'রে কাঁটা দিয়ে উঠে। শহরের এক ডাকসাইটে পালোয়ান, কানা-পালোয়ান তার নাম, বাড়ির শিশু বালক সবার সঙ্গেই কুস্তি লড়তে আসে। আসলে কুস্তি কুস্তি খেলা।

বাড়ির অনেকটা ফাঁকা জায়গায় পাঁচিল-ঘেরা গোলাবাড়িতে কুস্তির জন্য একটা চালাঘর। সেখানে এক হাত গভীর মাটি খুঁড়ে আলগা ক'রে তাতে এক মণ সরষের তেল মাখিয়ে কুস্তির জন্য জমি তৈরি করা হয়েছে। সেই বয়সে কানা-পালোয়ানের সঙ্গে রবির প্যাঁচ-কষা ছিলো আসলে ছেলেখেলা মাত্র। গোটা গায়ে মাটি মাখামাখি ক'রে শেষে একটা জামা জড়িয়ে রবি ফিরতো অন্দর মহলে, মায়ের কাছে। রোজ সকালে এত মাটি-মাখা মা পছন্দ করতেন না। যদি

রবির গায়ের রঙ মেটে হয়ে যায় ! এই ভয়ে ছুটির দিন রবির দেহের রঙ শোধন চলতো । তখনকার দিনে এত সাবান-টাবান ছিলো না । তার বদলে বাড়িতেই গায়ে মাখার মলম তৈরি হতো—বাদাম-বাটা, দুধের সর, কমলালেবুর খোসা, আরও কত-কী দিয়ে ।

তারপর সাতটা বাজতে না-বাজতেই বই-স্লেট বগলে নিয়ে পড়তে বসতে হতো টেবিলে । ঘড়ি-ধরা ঠিক সাতটায় মাস্টার মশায় নীলকমল ঘোষাল পড়াতে আসতেন । তাঁর সময় জ্ঞান এত টনটনে যে, ঘড়ির কাঁটা একটুও এদিক-ওদিক হতো না । কালো বোর্ডের উপর সাদা খড়ি দিয়ে দাগ কেটে তিনি পড়ানো শুরু করতেন । সেই অল্প বয়সেই রবিকে শিখতে হতো—পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি অংকের কত-সব নিয়মকানুন । আর সাহিত্যে পড়তে হতো—'সীতার বনবাস, থেকে 'মেঘনাদবধ' কাব্য পর্যন্ত । প্রকৃতি বিজ্ঞানও বাদ যেতো না । শিক্ষক সীতানাথ দত্ত মাঝে মাঝে এসে বিজ্ঞানের ভাসা ভাসা জ্ঞান দিয়ে যেতেন । বিজ্ঞান-শেখা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল । জ্বাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নিচের জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারি জল নিচে নামিতে থাকে, এবং এইজন্যই জল টগ্‌বগ্ করে—ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব

করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুধের মধ্যে জল জিনিসটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প-আকারে মুক্তিলাভ করে বলিয়াই দুধ গাঢ় হয়, এ কথাটাও যেদিন স্পষ্ট বুঝিলাম সেদিনও ভারি আনন্দ হইয়াছিল। যে-রবিবারে সকালে তিনি না আসিতেন, সে-রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।”

সেই সময়ে কোন কোন সকালে রবিকে শিখতে হতো হাড় দিয়ে গড়া মানুষের ভেতরের গঠন কেমন। শেখাতেন মেডিকেল কলেজের এক ছাত্র আস্ত একটা নর-কঙ্কাল দেওয়ালে ঝুলিয়ে। রবির শোবার ঘরেও একটা কঙ্কাল ঝোলানো থাকতো। শুয়ে শুয়ে রবি দেখতো, হাওয়ায় নাড়া পেয়ে হাড়গুলো খটখট শব্দ করে। শুনে শুনে আপনা থেকেই রবির ভয় ভেঙে যায়।
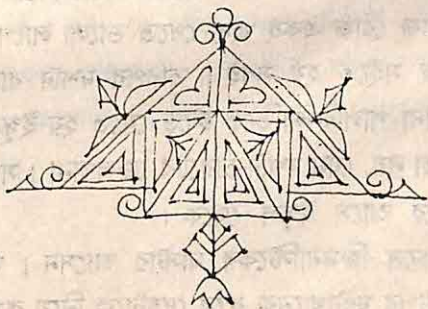
কালো ছাতা এগিয়ে আসে

সকালে পড়তে পড়তেই রবি এক সময় দেখে, সূর্য আকাশে অনেকটা উঠে গিয়েছে, উঠোনের অর্ধেক জায়গা জুড়ে সূর্যের ছায়া হেলে পড়েছে, ন'টা তখন বাজে। বেঁটে-কালো গোবিন্দ তখন কাঁধে ময়লা একটা গামছা ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রবিকে স্নান করতে নিয়ে যাবে। স্নানের পর সাড়ে ন'টা বাজতেই প্রতিদিনের বরাদ্দ ডাল আর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে হয়। রোজ রোজ একই খাদ্য খেতে ভালো লাগে না রবির। মুখ বুজে সইতে হয় সবই। তারপর দশটা বাজে। বুড়ো ঘোড়া-টানা পালকি-গাড়িতে চ'ড়ে যেতে হয় ইস্কুলে। ভাবে, ইস্কুল তো নয়, যেন দশটা-চারটের জেলখানা! সাড়ে চারটের পর ফিরে আসে ইস্কুল থেকে।

বিকেলে জিম্‌নাস্টিকের মাস্টার আসেন। তাই কাঠের ডাণ্ডার উপর ঘণ্টাখানেক ধ'রে দেহটাকে নিয়ে কসরত করতে

হয় রবিকে। তিনি যেতে-না-যেতেই চলে আসেন ছবি-আঁকার মাস্টার মশায়। আঁকাজোখা নিয়ে অনেকটা সময় যায়।

তারপর সন্ধে লাগতেই পড়ার ঘরে তেলের বাতি জ্বলে ওঠে। ইংরেজির শিক্ষক অঘোরবাবু এসে হাজির। তখন কালো মলাটের ইংরেজি-রীডার খুলতে হয় রবিকে। পড়তে পড়তে রবি ঢুলে, ঢুলতে ঢুলতে চমকে ওঠে। তাই, এই অবস্থায় যতো সে পড়ে, তার থেকে না-পড়ে অনেক বেশি। তবে ঘুম-ঘুম চোখে পড়া আর না-পড়ার সময় দৈবাৎ-ই যদি বড়দা এসে পড়ে কোনদিন, তখন তখনই ছুটি দিয়ে দেন। ছুটি পেলে ঘুম ভাঙতে আর বিন্দু-মাত্র বিলম্ব হয় না।

একদিন সন্ধ্যায় মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়িয়ে, বাড়ির পুকুরটা কানায় কানায় ভরে উঠেছে। অঘোরবাবুর পড়াতে আসার সময়ও দু-চার মিনিট উৎরে গিয়েছে। এই বর্ষার-সন্ধ্যায় রবি বসে বসে ভাবে, মাস্টার মশায় আজ আসবে না। ভাবতে তার ভালো লাগে, আজ আর পড়তে হবে না যে। মনে একটা আনন্দের শিহরণ জাগে। কিন্তু ও কে! ওই দূরে, ছাতি মাথায় এদিকেই এগিয়ে আসে! রবির বুকের ভেতরের হৃদ্‌পিণ্ডটা হঠাৎ আছড়ে পড়ে হতাশায়। কালো ছাতা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেই রবি দেখে, অঘোরবাবু!
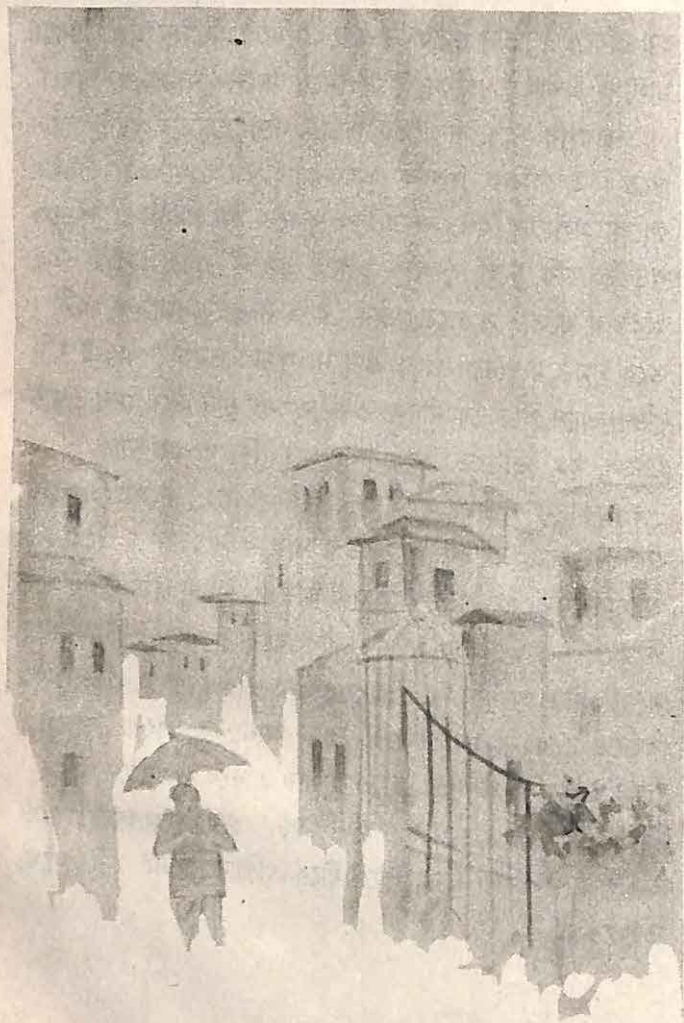
কালো ছাতা এগিয়ে আসে

বাংলা-পরীক্ষায় প্রথম

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে রবিকে বেশি দিন পড়তে হয় নি। এই ইস্কুল থেকে চলে গিয়ে রবি ভর্তি হয় নর্মাল ইস্কুলে। ইস্কুলটি ঠাকুর-বাড়ির কাছাকাছি চিৎপুর রোডের [এখনকার নাম, রবীন্দ্র সরণী] জোড়াসাঁকোতে। এটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় রবির বয়স খুবই কম ছিলো।

বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হওয়ার আগে সব পড়ুয়াকেই একটা গ্যালারিতে উঠে বসতে হতো। তারপর সবাই একই সঙ্গে গানের সুরে একটা কবিতা আবৃত্তি করতো। আবৃত্তির কথাগুলো ছিলো ইংরেজি আর তার সুরও ছিলো 'তথৈবচ'—পড়ুয়ারা কী মন্ত্র আওড়াতো এবং কী অনুষ্ঠান করতো কিছুই তারা বুঝতো না। অথচ এই একঘেয়ে গানটা প্রতিদিনই তাদের গাইতে হতো। ছোট ছোট ছেলেদের মুখে

সেই ইংরেজি-গান কী ভাষায় পরিণত হয় তা ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ বুঝতে চাইতো না। তারা ভাবতো, এই গানের ভেতর দিয়েই ছেলেদের অফুরন্ত আনন্দ দিচ্ছে। কিন্তু গানটা কী ?

রবীন্দ্রনাথের কথায় ঃ

"কেবল একটা লাইন মনে পড়িতেছে—

কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং।

অনেক চিন্তা করিয়া কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি—কিন্তু 'কলোকী' কথাটা যে কিসের রূপান্তর তাহা আজও ভাবিয়া পাই নাই। বাকি অংশটা আমার বোধ হয়—

Full of glee, singing merrily, merrily, merrily."

এক বছর পর এই নর্মাল ইস্কুলেই বাৎসরিক পরীক্ষায় বাংলায় সবার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে রবি প্রথম হয়। পরীক্ষক ছিলেন ইস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়। কিন্তু মজা হলো, অন্য একজন শিক্ষক রবির প্রথম হওয়া মানতে চাইলেন না। তিনি ইস্কুলের প্রধানকে জানালেন, পরীক্ষক রবির প্রতি পক্ষপাত করেছেন। ফলে রবিকে আরেকবার পরীক্ষায় বসতে হলো। এবারে স্বয়ং সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পরীক্ষকের পাশে চৌকিতে বসে তদারকি করলেন। রবির সৌভাগ্য যে, এবারও সেই প্রথম হয়।

প্রাইজ-না-পাওয়ার প্রাইজ

"ইস্কুলে আমি কোনোদিন প্রাইজ পাই নাই, একবার কেবল সচ্চরিত্রের পুরস্কার বলিয়া একখানা 'ছন্দোমালা' বই পাইয়াছিলাম। আমাদের তিনজনের মধ্যে সত্যই পড়াশুনায় সেরা ছিল। সে কোনো-একবার পরীক্ষায় ভালোরূপ পাস করিয়া একটা প্রাইজ পাইয়াছিল। সেদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই দৌড়িয়া গুণদাদাকে খবর দিতে চলিলাম। তিনি বাগানে বসিয়া ছিলেন।

আমি দূর হইতেই চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিলাম, 'গুণদাদা, সত্য প্রাইজ পাইয়াছে।' তিনি হাসিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি প্রাইজ পাও নাই ?' আমি কহিলাম, 'না, আমি পাই নাই, সত্য পাইয়াছে।' ইহাতে

গুণদাদা ভারি খুশি হইলেন। আমি নিজে প্রাইজ না পাওয়া সত্ত্বেও সত্যর প্রাইজ পাওয়া লইয়া এত উৎসাহ করিতেছি, ইহা তাঁহার কাছে বিশেষ একটা সদ্‌গুণের পরিচয় বলিয়া মনে হইল। তিনি আমার সামনেই সে-কথাটা অন্য লোকের কাছে বলিলেন।

এই ব্যাপারের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরবের কথা আছে, তাহা আমার মনেও ছিল না ; হঠাৎ তাঁহার কাছে প্রশংসা পাইয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। এইরূপে আমি প্রাইজ না পাওয়ার প্রাইজ পাইলাম,....”

এই গুণদাদা অর্থাৎ গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাকা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। আর গুণেন্দ্রনাথের পুত্র ছিলেন অবন ঠাকুর বা অবনীন্দ্রনাথ, বিশ্বখ্যাত চিত্রশিল্পী।

গুণদাদা রবিকে খুবই ভালবাসতেন। দুপুরে আহারের পর গুণেন্দ্রনাথ যখন কাছারিঘরে গিয়ে কৌচে হেলান দিয়ে বসতেন, তখন রবি গুটি গুটি তাঁর কোল ঘেঁসে বসতো। আর তখন গুণদাদা তাঁর রবিভাইকে ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে নানা গল্প বলতেন। রবি যখন দাদার কাছে শুনতো, লর্ড ক্লাইভ ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে অবশেষে দেশে ফিরে নিজের গলায় ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করে তখন সে ভারি অবাক হয়। বেদনাও পায় খুব।

এই গুণদাদা একদিন রবির পকেট থেকে কবিতা লেখার সেই নীলখাতাটি পেয়ে যায়। তাতে 'ভারতমাতা' শিরোনামে একটা কবিতা লেখা ছিলো। কবিতাটির একটি লাইনের শেষে

শব্দটি ছিলো—'নিকটে'। তার সঙ্গে মিল রাখতে পরের লাইনের শেষে তাই শিশু কবিকে লিখতে হয়েছিলো—'শকটে'। অথচ শকট শব্দটির সংযোজনায় অর্থের গরমিল হয়, ওটা কোনমতেই ব্যবহার করা যায় না।

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ—

"গুণদাদার প্রবল হাস্যে, ঘোড়াসুদ্ধ শকট যে দুর্গম পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথ দিয়াই কোথায় অন্তর্ধান করিল এ-পর্যন্ত তাহার আর-কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই।"
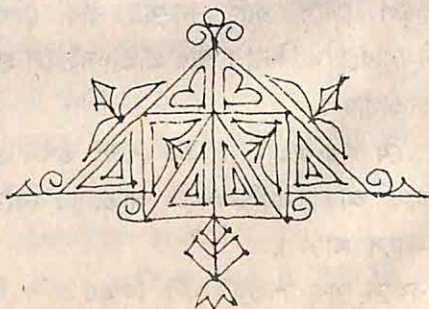
সেই বয়সের বিস্ময়

ঠাকুর-বাড়ির দক্ষিণ দিকের বারান্দায় এক কোণে গাছ লাগালে কেমন হয় ! রবি ভাবে । ভাবনা থেকেই কাজ শুরু । আতা ফলের একটা বিচি সংগ্রহ করে সে । তারপর সেটা সেখানে পুঁতে দেয় কিছুটা মাটি বিছিয়ে । প্রতিদিন জল দিতে থাকে । ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই রবি দেখতে যায়, আতাগাছটা বেরিয়েছে কিনা । আর প্রতিদিনই সে হতাশ হয় । কোথায় আতাগাছ !

এভাবে যে গাছ জন্মায় না, এই বোধই তখন তার নেই । তবু সে ভাবে, আতার বিচি থেকে আতাগাছ বেরোবে, ফল ধরবে ; মজাসে খাবে ।

সেই বয়সে সব শিশুরই এই বিস্ময় ।

শিশুরবি আরও ভাবতো, পৃথিবীর ভেতরের তলাটা দেখতে কেমন! যেটুকু সে দেখে সেটুকু তো শুধু পৃথিবীর উপরটার মেটে রঙের মলাট। আচ্ছা, উপরের ওই মলাট খুলে ফেলা যায় না? খুলতে পারলে দেখতে কেমন হয় ভেতরটা!

ভাবে, একটার পর আর-একটা বাঁশ যদি ঠুকে ঠুকে মাটিতে পোঁতা যায়! অনেক অনেক বাঁশ...... তাহলে! তাহলে কি পৃথিবীর একেবারে তলার নাগাল পাওয়া যায় না?

সেই সময় ঠাকুর-বাড়ির মাঘোৎসব উপলক্ষে উঠানের চারধারে সারি সারি কাঠের থাম পুঁতে কাচের ঝাড় টাঙানো হতো! মাঘ মাসের প্রথম থেকেই শুরু হতো মাটি-কাটার কাজ। বাড়ির ছেলেদের কাছে উৎসবের আমেজ তখন থেকেই শুরু। সব ছেলেরই টান কিন্তু উৎসবের দিকে। আর রবির শুধু ওই মাটি-কাটাতে।

প্রতিবছরই সে দেখে, মাটি খোঁড়া হয়, আর গর্তও বড় হতে হতে বিরাট হাঁ হয়। আরও দেখে, একটা মানুষ সেই গর্তের ভেতরে তলিয়ে যায়। রবিও অবাক বিস্ময়ে পাতালের দিকে চাইতে থাকে। কিন্তু কোথায় সেই স্থান যেখানে রাজপুত্র বা কোটালপুত্র পাতালপুরিতে পৌঁছে জিরিয়ে নেবে পক্ষিরাজকে বেঁধে!

রবি ভাবে, তার হুকুমে যদি চলতো সব তাহলে সে বলতো, আরো খুঁড়ো, আরো খুঁড়ো, আরো খুঁড়ো—একেবারে পৃথিবীর অন্দর-মহল পর্যন্ত।

কিন্তু হায়! ছোটদের কথা বড়োরা কি মানে!

একদিন এক শিক্ষকের কাছে রবি শুনলো—“আকাশের ওই নীল গোলকটি কোনো-একটা বাধামাত্রই নহে ; তখন সেটা কী আশ্চর্যই মনে হয়েছিল। তিনি বললেন, ‘সিঁড়ির উপর সিঁড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিয়া যাও-না, কোথাও মাথা ঠেকিবে না’।

রবি ভাবে, শিক্ষক মশায় কী ভীষণ কৃপণ। তাই সে গলার সুর চড়িয়ে বলে ওঠে, ‘আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি’। তারপর রবি বোঝে, সিঁড়ির সংখ্যা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই, কিছুতেই ওই নীল আকাশ ধরা-ছোঁয়া যায় না।

কিন্তু এ থেকেও তার বিস্ময় হলো—এই আশ্চর্য ঘটনাটা শুধু মাস্টার মশায়রাই জানেন, আর কেউই নয়।
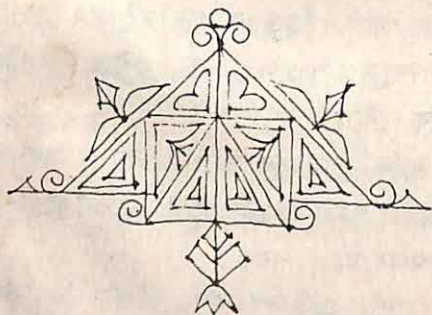
চিংড়িমাছ আর পানতা-ভাত

ঠাকুর-বাড়ির আঙিনায় এক-একদিন আসে ভালুক নিয়ে ভালুক-নাচওয়ালা, ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে ভালুক-নাচ দেখায়। আসে সাপুড়ের দল সাপের খেলা দেখাতে। আবার, কোন-কোনদিন ভোজবাজিওয়ালা এসে অবাক-করা খেলা দেখিয়ে তাক-লাগিয়ে দেয়। এইসব খেলা দেখে রবি ভারি মজা পায়।

কলকাতা শহরে তখন মাঠজোড়া ফুটবল-খেলার লম্ফঝম্ফ ছিলো না। সে সাগরপারের ব্যাপার-স্যাপার। ক্রিকেট তো আরও পরে আসে ভারতে। তবে ক্রিকেটের দূর কুটুম্ব এদেশের ডাংগুলি বা গুলিডাণ্ডার প্রচলন ছিলো খুব। আর ছিলো মার্বেল-খেলা, লাট্টু-খেলা, ঘুড়ি-ওড়ানো এইসব।

কোনটা দেখে আর কোনটা খেলে ছোট্ট রবির দিন কাটতো। কোন্ খেলায় যে সে পাকাপোক্ত ছিলো তা কিন্তু জানা যায় না।

এমন সময় একদিন বাড়িতে বাজল সানাই, নতুন বৌ এলো ঘরে—রবির দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী। রবি তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে আর ভাবে, এ যে চেনাশোনার বাইরের সীমানা থেকে আসা মায়াবী দেশের নতুন মানুষ। আর এই নতুন মানুষেরই বেশি আদর সবার কাছে। তার আদরের আসনে বসে পড়েছে ও। সে এখন হেলাফেলায় ছেলেমানুষ। তাই রবি দূরে দূরে ঘুরে বেড়ায়, বৌঠাক্‌রুনের কাছে যেতে সাহস হয় না। কিন্তু ক'দিন যেতে না-যেতেই সব ওলটপালট হয়ে যায়।

নতুন বৌয়ের জায়গা হয়েছে ভেতরের বাড়ির ছাদের লাগাও ঘরে। পুরো ছাদটা তারই দখলে। সেখানে রবির ছোড় দিদির সঙ্গে বৌদিদির পুতুল-খেলা চলে। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতাও পড়ে সেখানে। আর নেমন্তন্নের দিনে প্রধান আসনটি কিন্তু দেবর রবিরই। বৌঠান তাকে দারুণ আদর করে।

'ছেলেবেলা'-তে লেখা ঃ

"বৌঠাক্‌রুন রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন, এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পানতা ভাত যেদিন

মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না। মাঝে মাঝে যখন আত্মীয়-বাড়িতে যেতেন, ঘরের সামনে তাঁর চটি জুতোজোড়া দেখতে পেতুম না, তখন রাগ করে ঘরের থেকে একটা-কোন দামি জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়ার পত্তন করতাম। বলতে হত, 'তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে। আমি কি চৌকিদার।'. তিনি রাগ দেখিয়ে বলতেন, "তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো।"
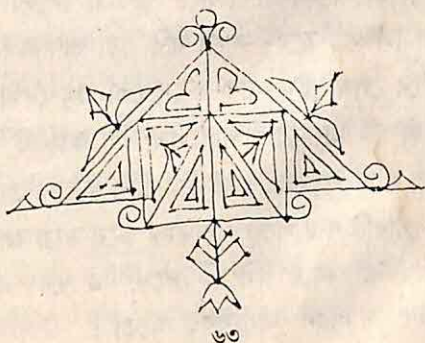
কবিতা-লেখা শুরু

রবির বয়স তখন সাত-আট বছর হবে। তার এক ভাগ্নে জ্যোতিঃপ্রকাশ রবির থেকে বয়সে একটু বড়ো। হঠাৎ-ই তার শখ হলো রবিকে কবিতা লেখা শেখাবে। তাই একদিন দুপুরবেলায় সে রবিকে তার ঘরে ডেকে বললো, তোমাকে পদ্য লিখতে হবে। এই ব'লে সে তাকে পয়ারছন্দে চোদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিনীতি বুঝিয়ে দিলো।

পদ্য লিখতে হবে—শুনে রবি তো অবাক ! পদ্য আবার চেষ্টা ক'রে লেখা যায় নাকি ? সে তো শুধু দেখা যায় বইয়ের পাতায় ছাপার অক্ষরে। পদ্যলেখা সে কল্পনাই করতে পারে না। তার মনে পড়লো, সেই চোরটির কথা। তাদের বাড়িতে একদিন চোরটি ধরা পড়ে। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আর কৌতূহলে রবি চোরটির কাছে গিয়ে দেখে, এ যে একটি মানুষ, একেবারেই সাধারণ মানুষেরই মতো।

পদ্য-রচনাও তো তাই। গোটা কয়েক শব্দ নিজের হাতে পাশাপাশি সাজিয়ে জোড়াতাড়া দিতেই পয়ার হয়ে ওঠে ! বেশ মজা পায় রবি। তার যখন ভয় ভাঙল তখন তাকে ঠেকায় কে। কবিতা লেখা শুরু হয়।

বাড়ির একজন কর্মচারীর কাছ থেকে নীল কাগজের একখানি খাতা জোগাড় করলো। তাতে আপন হাতে পেনসিল দিয়ে কতকগুলো অসমান লাইন কেটে বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখতে শুরু করে দিলো। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন ঃ

"হরিণশিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায় নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমি সেই রকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম। বিশেষত, আমার দাদা আমার এই সকল রচনায় গর্ব অনুভব করিয়া শ্রোতাসংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন।"

একদিন হল কি, জমিদারি-কাছারির আমলাদের কাছে কবিতা লেখার খবর দিয়ে দুই ভাই যখন আসছে তখন দেখে, 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রের এডিটর নবগোপাল মিত্র মশায় বাড়িতে আসছেন। রবির দাদা তৎক্ষণাৎ তাঁকে ডেকে হেঁকে বললেন, 'নবগোপালবাবু, রবি একটা কবিতা লিখিয়াছে, শুনুন-না।'

পদ্মের উপর লেখা একটা কবিতা তখন রবির পকেটে পকেটে ঘুরছিল। রবি তখন উচ্চকণ্ঠে তাঁকে শুনিয়ে দিলো।

তিনি একটু হেসে বললেন, "বেশ হইয়াছে, কিন্তু ওই 'দ্বিরেফ শব্দটার মানে কী।"

'দ্বিরেফ' শব্দটির বদলে 'ভ্রমর' শব্দটি ব্যবহার করলেই অর্থটা স্পষ্ট হতো এবং কবিতার ছন্দও ঠিক থাকতো। কিন্ত কেন যে রবি ওই দুরুহ শব্দটা প্রয়োগ করলো এবং কোথা থেকেই-বা ওটা সংগ্রহ করেছে কিছুই তার তখন মনে নেই। অথচ দপ্তরখানার আমলারা ওই শব্দটি শুনে তাকে তারিফ করেছে বলেই রবির মনে হয়েছে। আর নবগোপালবাবু কিনা ওটা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন ! এমন কি তিনি হেসেও উঠলেন।

রবির তখন দৃঢ় বিশ্বাস হলো, নবগোপাল মিত্র আসলে সমজদার লোক নন। তাঁকে আর কোনদিনই কবিতা শোনাই নি।
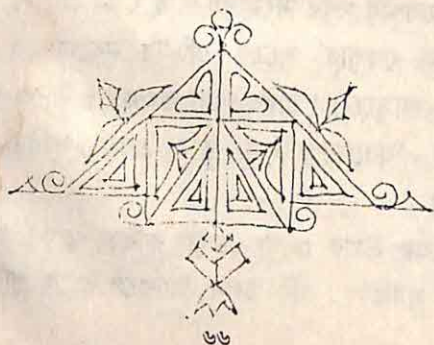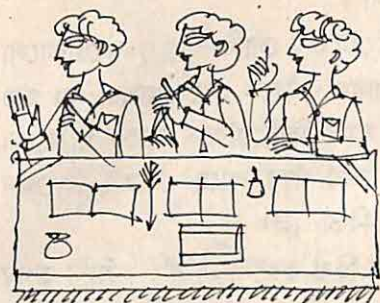
কবিতা চুরির অপবাদ

রবি কবিতা লেখে, লিখতে পারে—এই খবরটা সে নিজেই একে ওকে তাকে বলতে শুরু করলো। এ খবর এক সময় সাতকড়ি দত্ত মশায়ের কানে গেল। তিনি নর্মাল ইস্কুলের শিক্ষক। একদিন রবিকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি নাকি কবিতা লিখিয়া থাক।" লেখার কথা রবি গোপন করলো না। এরপর থেকে তিনি রবিকে উৎসাহ দেবার জন্য মাঝে মাঝে দুই-এক পদ কবিতা দিয়ে, বাকীটা পূরণ করে আনতে বলতেন। যেমন, তিনি একবার লিখে দিলেন—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

এর পর রবি জুড়ে দিলো।

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

আরেক দিনের ঘটনা।

রবির ইস্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট্ গোবিন্দবাবু কুচকুচে কালো বেঁটেখাটো মোটাসোটা মানুষ। তাঁকে দেখে ছাত্ররা খুব ভয় করতো। একদিন ছুটির সময় তিনি রবিকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। রবি ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে যেতেই জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি নাকি কবিতা লেখ।"

কবুল করতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা করলো না রবি। তিনি তখন রবিকে আদেশ করলেন একটা কবিতা লিখে আনতে। বিষয়-বস্তুও ব'লে দিলেন।

পরের দিনই রবি কবিতা লিখে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখালো। কবিতাটি পড়েই তিনি রবিকে সঙ্গে নিয়ে ছাত্রবৃত্তির ক্লাশের সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, "পড়িয়া শোনাও।"

আশ্চর্য! শোনার পর অধিকাংশ ছেলেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, এলেখা নিশ্চয়ই রবির লেখা নয়। একজন আবার বললো, যে ছাপার বই হতে এ লেখা চুরি করা হয়েছে, সে সেটা এনে দিতে পারে। কেউই তাকে নিয়ে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করলো না। তারা সবাই বিশ্বাসই করলো, এই কবিতাটা অন্যের লেখা থেকে চুরি করা।

সেই বয়সে রবির লেখা আরেকটা কবিতার কিছু অংশ—

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস্ হুপুস্ শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

গান শুনে মা অবাক

রবিবার সকালে রবি গান শিখতো গানের শিক্ষক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে। ঠাকুরবাড়ির গানের পাঠশালায় বিষ্ণুবাবু যে-সব গান শেখাতেন সেগুলো আসলে পাড়াগাঁয়ের ছড়া। যেমন,

এক যে ছিল কুকুরচাটা
শেয়ালকাঁটার বন
কেটে করলে সিংহাসন।

অথবা,

চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে,
জোনাক জ্বালে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হল,
ফার্সি পড়ে তাঁতি।

এখনকার দিনে গান শিখতে হলে প্রথমেই হারমোনিয়াম ধরে সুর লাগিয়ে সা রে গা মা সাধতে হয়। আর তখন ? তখন এদেশে হারমোনিয়াম আসে নি। কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গানের রেওয়াজ করতে হতো। আর শিশুদের মন-ভোলানো গান শেখানোর জন্য ওইসব পাড়াগেঁয়ে ছড়া।

গান শেখা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা'-তে লিখেছেন ঃ

"আমার দোষ হচ্ছে, শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশি দিন চালাতে পারে নি। ইচ্ছে মত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভর্তি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত তা হলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না। কেননা সুযোগ ছিল বিস্তর। যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা ততদিন বিষ্ণুর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়েছি। কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেজদাদা বেহাগে আওড়াচ্ছেন 'অতি-গজ-গামিনী রে', আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে ছাপ তুলে নিচ্ছি। সন্ধেবেলায় মাকে সেই গান শুনিয়ে অবাক করা খুব সহজ কাজ ছিল।

আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন, হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে, গুনগুন গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চার দিকে। তিনি তো গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন ;

কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফুর্তি যখন রাখতেন পারতেন না দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল জ্বল করত, গান ধরতেন—'ময় ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী'। সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।"

ওই গানটি রবির গলায় গাইয়ে শোনাবার জন্য শ্রীকণ্ঠবাবু তাকে নিয়ে ঘরে ঘরে যেতেন, এক-একদিন যেতেন আবার একজন য়ুরোপীয় মিশনরির বাড়িতে।

রবি ঠাকুরের জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা এই শ্রীকণ্ঠবাবুকে জড়িয়েই।

একদিন রবিকে নিয়ে শ্রীকণ্ঠবাবু ফটো তুলতে গেলেন একজন ইংরেজ ফটোগ্রাফারের দোকানে। তাঁর সঙ্গে তিনি হিন্দিতে বাংলাতে আলাপ জমিয়ে তুললেন, তারপর অত্যন্ত আত্মীয়ের মতো বললেন, ছবি তোলার জন্য অতো বেশি দাম আমি কিছুতেই দিতে পারবো না সাহেব, আমি গরিব মানুষ। না না সে হবে না সাহেব, আমি দিতে পারবো না।

তাঁর কথাবার্তায় সাহেব কিন্তু খুশিই হলেন আর কম দামে ছবি তুলে দিলেন।

এই ছবিই রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম ছবি, সঙ্গে শ্রীকণ্ঠবাবু তো বটেই এবং দাদা সোমেন্দ্রনাথ ও ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেবো মেপে'—বৃষ্টি পড়ার এই ছড়াটি সব শিশুই তো গায়। শিশু-রবি গেয়েছি কি ! জানা নেই। শুধু জানা আছে, শিশু-রবির মনকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে—বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।' তাই তো তিনি মাঝ-বয়সে লিখেছেন, 'ওই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত'।

আরও বলেছেন তিনি :

"বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি। বাতাসের বেগে জলের ছাটে বারান্দা একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে, সারি সারি ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে,

প্যারীবুড়ি কক্ষে একটা বড়ো ঝুড়িতে তরিতরকারি বাজার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে জলকাদা ভাঙিয়া আসিতেছে, আমি বিনা কারণে দীর্ঘ বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছি।

আর মনে পড়ে, ইস্কুলে গিয়াছি ; দরমায়-ঘেরা দালানে আমাদের ক্লাশ বসিয়াছে ; অপরাহ্নে ঘনঘোর মেঘের স্তূপে স্তূপে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে ; দেখিতে দেখিতে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল ; থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ একটানা মেঘ-ডাকার শব্দ ; আকাশটাকে যেন বিদ্যুতের নখ দিয়া এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত কোন্ পাগলি ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিতেছে ; বাতাসের দম্‌কায় দর্‌মার বেড়া ভাঙিয়া পড়িতে চায় ; অন্ধকারে ভালো করিয়া বইয়ের অক্ষর দেখা যায় না, পণ্ডিতমশায় পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ; বাহিরের ঝড়-বাদলটার উপরেই ছুটাছুটি-মাতামাতির বরাত দিয়া বদ্ধ ছুটিতে বেঞ্চির উপরে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে মনটাকে তেপান্তরের মাঠ পার করিয়া দৌড় করাইতেছি।

আরও মনে পড়ে শ্রাবণের গভীর রাত্রি, ঘুমের ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘনবৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দ মনের ভেতরে সুপ্তির চেয়েও নিবিড়তর একটা পুলক জমাইয়া তুলিতেছে ; একটু যেই ঘুম ভাঙিতেছে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি, সকালেও যেন এই বৃষ্টির বিরাম না হয় এবং বাহিরে গিয়া যেন দেখিতে পাই, আমাদের গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে এবং পুকুরের ঘাটের একটি ধাপও আর জাগিয়া নাই।"

বর্ষার সেই বারিধারা ঠাকুরবাড়ির পুকুরটিকেই শুধু কানায়

কানায় ভরিয়ে তোলে নি, ভরিয়ে তোলে সেই বাড়িরই ছোট্ট শিশু রবির মনকে। টাপুর টুপুর বৃষ্টিই বালক-রবিকে সোনার টোপর পরায়, আর শরতের বিন্দু বিন্দু শিশির সেই বালকের সরস-সবুজ মনে সৃষ্টির বীজ বোনে।

বর্ষার বৃষ্টি-ঝরা দুপুরে 'জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে' এক মনে ছবি আঁকতো রবি।

শরতের আকাশ আর আলোয় বসে গান বেঁধে গুন গুন গাইতো রবি। এই শরৎ নিয়েই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"সে যেমন চাষিদের ধান-পাকানো শরৎ তেমনি সে আমার গান-পাকানো শরৎ; সে আমার সমস্ত দিনের আলোকময় অবকাশের গোলা-বোঝাই করা শরৎ; আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ-পুলকে ছবি-আঁকানো গল্প-বানানো শরৎ।"
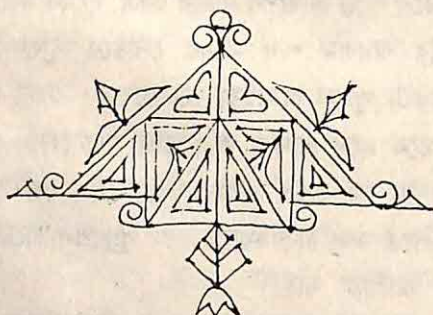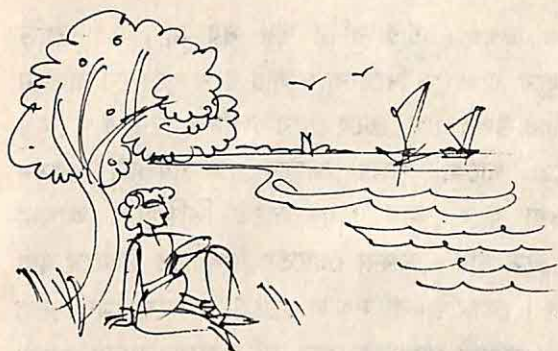
ওপারেতে ঝাপ্‌সা গাছপালা

কলকাতায় একবার ডেঙ্গুজ্বরে ছেয়ে যায়, ঘরে ঘরে ডেঙ্গুজ্বর। তাই ঠাকুর-বাড়িতেও ভয় হয়। তখন বাড়ির ছোটদের গঙ্গার ওপারে কোন্নগরে পাঠানো হয়। কয়েকজন বয়স্কসহ ছোটরা সবাই সেখানের পেনেটিতে একটি বাগান-বাড়িতে আশ্রয় নেয়। ছোটদের মধ্যে রবিও একজন।

ঠাকুর-বাড়ির বাইরে রবির এই প্রথম আসা। সেখানে বাগান-বাড়িতে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারা গাছ। তারই ছায়ায় বসে গঙ্গার দিকে চেয়ে চেয়ে রবির দিন কাটে। প্রতিদিন প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে পেয়ারা গাছের তলায় এসে রবির মনে হতো, দিনটি যেন সোনালি-পাড় দিয়ে মোড়া নতুন একটি পত্র। পত্রটি খুললেই মিলবে রহস্যে-ভরা

অপূর্ব এক জগৎ। তাই রবির ত্বর সয় না। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে এখোগুড় দিয়ে বাসি লুচি মুখে পুরে সে বাগানে এসে চৌকির উপর বসে, চেয়ে চেয়ে চারদিক দেখতে থাকে।

দেখতে থাকে, গঙ্গার জলের জোয়ারভাঁটা কেমন আসা-যাওয়া করে, আর তার স্রোতে ডিঙিগুলো আপনা থেকেই ভেসে যায়। অথবা স্রোতের বিপরীতে উজিয়ে যায় পাল তুলে। কোনদিন-বা সকাল হতেই আকাশে মেঘ দেখা দেয়, তখন ঝাপ্‌সা গাছপালা আর নদীর জলে তাদের কালো ছায়া। দেখতে দেখতে যদি বৃষ্টি নামে তো সামনের দিগন্ত তখন বৃষ্টি-ধারায় ঢাকা। আর পিছনে!

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"যেখানে আমরা বসিতাম তাহার পিছনে প্রাচীর দিয়া ঘেরা ঘাট-বাঁধানো একটা খিড়কির পুকুর-ঘাটের পাশেই একটা মস্ত জামরুল গাছ; চারিধারেই বড়ো বড়ো ফলের গাছ ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া ছায়ার আড়ালে পুষ্করিণীটির আবরু রচনা করিয়া আছে। এই ঢাকা, ঘেরা, ছায়া-করা, সংকুচিত একটুখানি খিড়কির বাগানের ঘোমটা-পরা সৌন্দর্য আমার কাছে ভারি মনোহর ছিল।"

গঙ্গার তীরে এই বাগান-বাড়িত এসেও ছোটদের কোন স্বাধীনতা ছিলো না। রবির মনে হতো, 'ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে—পায়ের শিকল কাটিল না।' একদিন হয়েছি কি, বাড়ির দু-জন বয়স্ক এক সকালে পাড়ায় বেড়াতে বের হলেন। কৌতূহলের আবেগ আটকাতে না পেরে রবিও চুপি
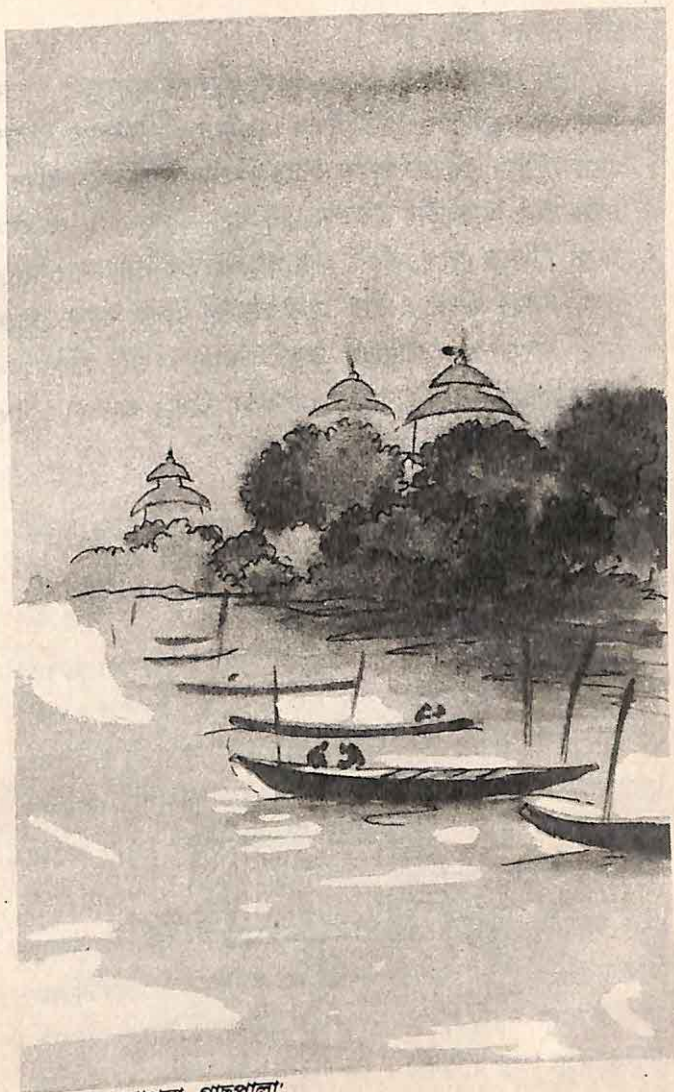
ওপারেতে ঝাপ্‌সা গাছপালা'

চুপি তাদের পিছু নেয়।

পিছু যেতে যেতে দেখে, গ্রামের গলিতে ঘনবনের ছায়ায় ঢাকা পানাপুকুরটিও কত সুন্দর! ওই পুকুরের ধারে খোলা গায়ে দাঁড়িয়ে একজন দাঁতন করছে। ভারি ভাল লাগে রবির। এমন সময় অগ্রবর্তীর একজন টের পায়—পিছু পিছু কে যেন আসে। ফিরে দেখে, রবি। আর তখুনিই ভর্ৎসনা, 'যাও যাও, এখনি ফিরে যাও"। তাঁর মনে হয়েছে, রবির পায়ে মোজা নেই, গায়ে শুধু সাধারণ একটি জামা। এই সাজে কি ঠাকুর-বাড়ির ছেলের বাইরে বেরোনো যায়! অতএব—যাও যাও, ফিরে যাও।
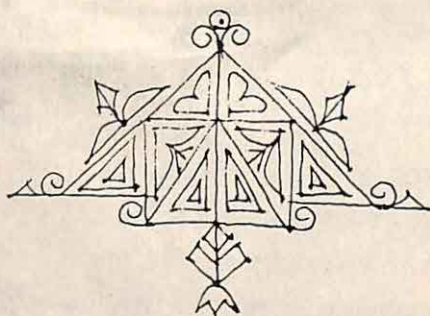
দূর থেকে দেখা

রবির যখন জন্ম হয় তার আগে থেকেই তার বাবা দেশভ্রমণে বেরোতেন। তাই তিনি শিশু-রবির কাছে ছিলেন প্রায় অপরিচিত। বাবা যখন বাড়িতে থাকতেন না তখন তাঁর তেতালার ঘর বন্ধ থাকতো। রবি চুপি চুপি ছিটকিনি টেনে দরজা খুলতো। তারপর ঘরে ঢুকে সোফার উপর সারাটা দুপুর চুপটি ক'রে ব'সে থাকতো। কোনোকোনো দিন আবার বাবার স্নানের ঘরে ঢুকে জলের কল খুলে দিয়ে ঝাঝরি থেকে পড়া জলে মনের সাধ মিটিয়ে স্নান করতো।

দেশভ্রমণ থেকে মহর্ষি যখন মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতেন তখন রবি দূর থেকেই বাবাকে দেখে কৌতূহল মেটাতো, তাঁর কাছাকাছি যেতে সাহস পেতো না। হয়তো ভয় ভয় করতো। একবার মহর্ষি গিয়েছেন হিমালয়-ভ্রমণে। এমন সময় রটলো, রাসিয়ানরা ভারত আক্রমণ করবে। লোকের মুখে মুখে কথাটা

রবির মা সারদা দেবীর কানে গেল। তিনি মনে মনে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, মহর্ষিকে জানানো দরকার তাড়াতাড়ি যেন বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু কে লিখবে চিঠি! তিনি তো লিখতে জানেন না। আবার, বাড়ির বড়োরা কেউই এতে উদ্বিগ্ন নয়। তাই, তিনি শেষে রবির কাছে এসে বললেন, "রাসিয়ানদের খবর দিয়া একখানা চিঠি লেখো তো বাবা।"

মহা মুস্কিলে পড়লো রবি। কেমন ক'রে চিঠি লিখতে হয়, কিছুই যে জানে না! কী করবে সে! শেষে দফতরখানায় মহানন্দ মুন্‌শির শরণাপন্ন হলো। তারপর বাবার কাছে পত্র পৌঁছুলো। পত্র পেয়ে মহর্ষি পুত্রকে উত্তর দিলেন। লিখলেন, "ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, রাসিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন।" এই প্রবল আশ্বাসবাণী শুনেও রবির মায়ের রাসিয়ান-ভীতি দূর হলো না। কিন্তু পিতার সম্বন্ধে রবির সাহস গেলো বেড়ে। তারপর থেকে রোজই সে বাবাকে পত্র লিখে মহানন্দের দফতরে দিয়ে আসতো ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সে-সব পত্র কোনোদিনই ডাকে দেওয়া হয় নি। এ খবর অবশ্যি রবি তখন জানে নি। জেনেছে অনেক পরে, বড়ো হয়ে।

বৈদিক মতে উপনয়ন

বেশির ভাগ সময় প্রবাসে থেকে অল্প কয়েক দিনের জন্য মহর্ষি যখন কলকাতায় আসতেন তখন ঠাকুর-বাড়িতে সাজো সাজো রব উঠতো। সমস্ত বাড়িটা যেন গম্‌গম্ করতো আর বাড়ির সবাই তটস্থ হয়ে থাকতেন। কোথাও হৈচৈ নেই, চেঁচামেচি নেই, সাবধানে চলছে সবাই। রন্ধনের কোন ত্রুটি হয়, এই ভয়ে রবির মা রান্নাঘরে গিয়ে বসতেন। বারান্দায় ছেলেরা গোলমাল বা দৌড়াদৌড়ি করে এজন্য মহর্ষির ঘরের সামনে মাথায় পাগড়ি ও গায়ে চাপকান পরে বৃদ্ধ বিনু হরকরা পাহারা দিতো। আর বাড়ির ছোটরা চলতো ধীরে ধীরে আর ভয়ে ভয়ে। মহর্ষির ঘরে উঁকি দিতেও কারোরই সাহস হত না।

মহর্ষি একবার বাড়ি ফিরলেন রবি সোম আর সত্যপ্রসাদের উপনয়ন দিতে। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক মতে দুই ভাই আর ভাগ্নের উপনয়ন হলো। এই সময় মাথা মুড়িয়ে

বীরবৌলি প'রে তিনজনকে তেতালার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ থাকতে হয়। তখন তাদের ভারি মজা ! এ ওর কানের কুন্তল ধরে টান দেয়, সে তার নেড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

সেই ঘরের এক কোণে একটা বাঁয়া তবলা ছিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রবি দেখতো, নিচের তলা দিয়ে ঠিক কে কখন যাচ্ছে। যেতে দেখলেই তবলাটাকে টেনে রবি ধপাধপ্ আওয়াজ তুলতো। আর সে তখন উপর দিকে চেয়েই মাথা নিচু ক'রে অপরাধের আশঙ্কায় ছুটে পালিয়ে যেতো।

নতুন ব্রাহ্মণ হওয়ার পর গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে রবির খুব-একটা ঝোঁক এসে গেলো। এক মনে এবং যত্ন ক'রে রবি ওই মন্ত্রটা জপ করতো।

তাঁর জীবনস্মৃতি-তে লেখা ঃ

"গায়ত্রীমন্ত্রের কোনো তাৎপর্য আমি সে-বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে, কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু-একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—

আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেজের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না ....।"
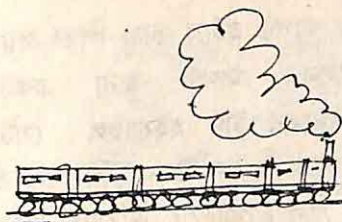
প্রথম বোলপুর গমন

উপনয়নের পর রবি ভাবতে থাকে, নেড়া মাথা নিয়ে কিভাবে সে ইস্কুল যাবে ! ইস্কুলের ফিরিঙ্গি পড়ুয়ারা হাসাহাসি করবে। এমন ভাবনার সময়ে একদিন তেতালার ঘর থেকে ডাক এল রবির। বাবা তাকে ডাকলেন। রবি যেতেই তিনি বললেন, আমার সঙ্গে হিমালয় যেতে চাও ? শুনে রবি মহা খুশি, আনন্দ আর ধরে না। মনে হয়, যেন চীৎকার ক'রে আকাশ ফাটিয়ে বলে, চাই চাই চাই। কোথায় বেঙ্গল একাডেমিতে পড়তে যাওয়া আর কোথায় বাবার সঙ্গে হিমালয় বেড়াতে যাওয়া।

হিমালয় যাত্রার আরম্ভে প্রথমে কিছুদিন বোলপুরে থাকার কথা। এই প্রথম রবির বোলপুর গমন। সত্যপ্রসাদ অবশ্য কিছুদিন আগেই সেখানে গিয়েছিলো। এই যাত্রা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া পিতার সঙ্গে গাড়িতে চড়িলাম। আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোশাক তৈরি

হইয়াছে। কী রঙের কিরূপ কাপড় হইবে তাহা পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। মাথার জন্য একটা জরির-কাজ-করা গোল মখমলের টুপি হইয়াছিল। সেটা আমার হাতে ছিল, কারণ নেড়া মাথার উপর টুপি পরিতে আমার মনে মনে আপত্তি ছিল। গাড়িতে উঠিয়াই পিতা বলিলেন, 'মাথায় পরো।' পিতার কাছে যথারীতি পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি হইবার জো নাই। লজ্জিত মস্তকের উপর টুপিটা পরিতেই হইল। রেলগাড়িতে একটু সুযোগ বুঝিলেই টুপিটা খুলিয়া রাখিতাম। কিন্তু, পিতার দৃষ্টি একবারও এড়াইত না। তখনই সেটাকে স্বস্থানে তুলিতে হইত।"

সত্যপ্রসাদের কাছে রবি আগেই শুনেছে, "বিশেষ দক্ষতা না থাকলে রেলগাড়িতে চড়া এক ভয়ঙ্কর সংকট, পা ফসকাইয়া গেলেই আর রক্ষা নাই। তারপর, গাড়ি যখন চলিতে আরম্ভ করে তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া খুব জোর করিয়া বসা চাই, নহিলে এমন ভয়ানক ধাক্কা দেয় যে মানুষ কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না।"

তাই হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেই রবির ভয়-ভয় করে। কিন্তু সে অতি সহজেই রেলগাড়িতে উঠে। ভাবতে থাকে, এখনও হয়তো গাড়ি-ওঠার আসল রহস্যটাই বাকি আছে। তারপর গাড়ি যখন বাঁশি বাজিয়ে ছেড়ে দেয় এবং ধীরে ধীরে চলতে থাকে তখনও কোথাও বিপদের একটুও আভাস পায় না সে। এতে আনন্দ তো নয় বরং মনটা বিমর্ষ হ'য়ে ওঠে।
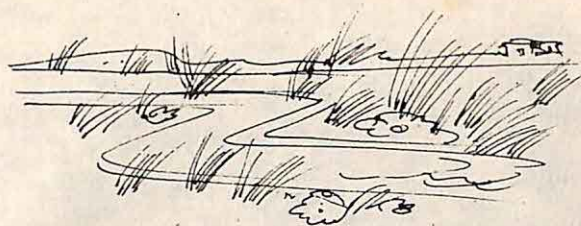
দূরবীনের উল্‌টাদিকের দেশ

রেলগাড়ি হাওড়া স্টেশন ছেড়ে ছুটতে লাগল। জানালার পাশে বসে রবি তখন দেখছে, তরুশ্রেণীর সবুজ-নীল পাড় দেওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ আর দূরের ছায়া ছায়া গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুই ধার দিয়ে পিছু দিকে চলছে। দেখতে দেখতে কখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আর বোলপুর স্টেশনেও পৌঁছে গেল গাড়িটি।

সেই সাঁঝের বেলায় বাবার সঙ্গে পালকিতে উঠল রবি। যেতে হবে বেশ কিছুটা দূরে কুঠিবাড়ি। যেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ওঠেন। সেটাই তাঁর আশ্রম, সেখানেই তাঁর উপাসনা-স্থল। পালকিতে চড়েই রবি চোখ বুজল। একেবারে কাল সকালে বোলপুরের সব কিছু দেখবে সে।

ভোরে উঠে দুরুদুরু বুকে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

দূরবীনের উল্‌টাদিকের দেশ

কোথায় সেই কুঠিবাড়ি থেকে রান্নাঘর যাওয়ার ছাদবিহীন অদ্ভুত পথ যেখান দিয়ে যেতে গায়ে রোদ-বৃষ্টি কিছুই লাগে না। ধ্যুৎ, যত আজগুবি কথা বলেছে সত্য। আর কোথায়-বা ধানের খেত আর ধানের ফলন! রাখাল বালকরাই-বা কোথায় যাদের সঙ্গে ধানখেত থেকে চাল সংগ্রহ করে ভাত রেঁধে সবাই মিলে বসে বসে খাওয়া! সবই বাজে কথা বলে সত্য।

একটু এগিয়ে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে চাইল চারিদিক। একি! ওই তো ছোট নদী বয়ে চলেছে, বুকভরা তার জলধারা। নদীর পাড়ে বালিমাটি আর লাল কাঁকরের ছোট ছোট পাহাড়। পায়ে পায়ে আরও এগিয়ে গেল রবি। আঁচল ভরে পাথর কুড়াল। তারপর সোজা বাবার কাছে।

মহর্ষি তৎক্ষণাৎ বললেন, "কী চমৎকার! এ-সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে!" রবি বলল, "এমন আরো কত আছে! কত হাজার হাজার! আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।"

এই তুচ্ছ কাজকে তুচ্ছ মনে করলেন না মহর্ষি। বরং পুত্রকে উৎসাহ দিতেই বললেন, "সে হইলে তো বেশ হয়। ওই পাথর দিয়া আমার পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।"

সেখানে একটি পুকুর কাটার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু মাটি এত কঠিন যে তা বাতিল করতে হয়। কিছুটা খোঁড়াতে যে মাটি উঠেছে তাতেই তৈরি হয়েছে উঁচু একটা স্তূপ বা পাহাড়। এই পাহাড়টাই নুড়ি-পাথর দিয়ে সাজাতে বললেন দেবেন্দ্রনাথ।

রবি বাবার কাছেই জেনেছে, ঢিবিওয়ালা খাদ আসলে

ছোট নদী নয়। একে বলে 'খোয়াই'। এমন অনেক খোয়াই আছে বোলপুরে। ঘুরতে ঘুরতে রবি একদিন দেখল, খোয়াইয়ের মধ্যে এক জায়গায় মাটি চুঁইয়ে একটা গভীর গর্তের মধ্যে জল জমা হয়েছে। সেই জল আবার ছাপিয়ে ঝির্‌ঝির্ করে বালি কেটে বয়ে যাচ্ছে। আর ছোট ছোট মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। কী মজা তার! তাই বাবাকে গিয়ে বলল, "ভারি সুন্দর জলের ধারা দেখিয়া আসিয়াছি, সেখান হইতে আমাদের স্নানের ও পানের জল আনিলে বেশ হয়।" বাবা বললেন, "তাই তো, সে তো বেশ হইবে।" আর সতি সত্যিই তিনি সেখান থেকে জল আনার ব্যবস্থা করলেন।

বালক-রবির বোলপুর-ভ্রমণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"আমি যখন-তখন সেই খোয়াইয়ের উপত্যকা-অধিত্যকার মধ্যে অভূতপূর্ব কোনো-একটা কিছুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত রাজ্যের আমি ছিলাম লিভিংস্টোন। এটা যেন একটা দূরবীনের উলটা দিকের দেশ। নদী-পাহাড়গুলোও যেমন ছোটো ছোটো, মাঝে মাঝে ইতস্তত বুনো-জাম, বুনো-খেজুরগুলোও তেমনি বেঁটে খাটো। আমার আবিষ্কৃত ছোটো নদীটির মাছগুলিও তেমনি, আর আবিষ্কারকর্তাটির তো কথাই নেই।"

বালক রবি কি তখন জানতো সমগ্র বিশ্বকে টেনে আনবে একদিন বোলপুরের খোয়াই-তীরে! আর এখানে গড়ে উঠবে সমগ্র বিশ্বের ছাত্র-ছাত্রীদের এক মিলনতীর্থ।